শ্রীঅরবিন্দের যোগ-পথ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

জনকল্যাণ সংসদ
৭এ, রামশেঠ রোড
কলিকাতা-৬

অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৭০

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট
পণ্ডিচেরী-২

প্রকাশক : জনকল্যাণ সংসদ
৭এ, রামশেঠ রোড
কলিকাতা ৬

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী-২
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীপ্রভা[illegible] দাস
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

আশ্রম শিশুদের প্রতি

শ্রীঅরবিন্দের যোগ-পথ

(শ্রীমায়ের ভাষণ অবলম্বনে)

সূচীপত্র

সাধনা

পৃষ্ঠা

যোগপন্থা গ্রহণ সম্বন্ধে

শ্রীঅরবিন্দের এই যোগপন্থাটি গ্রহণ করা মানেই হল পূর্ণ রূপান্তরের জীবনব্রত গ্রহণ করা, একেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্বরূপ ক'রে নেওয়া ; এ ছাড়া লক্ষ্য বলতে আর তোমার সামনে অন্য কিছুই রইল না। তুমি জ্ঞানতঃ সে রূপান্তবের কথা ভাবতে থাক বা না থাক, সর্বক্ষণ সেই ভাবটিই নিজের মধ্যে অনুভব হতে থাকবে। আব যোগের পথে যেতে যদি না চাও, তাহলে অন্যভাবে কোন মহৎ ইচ্ছা বা সেবাধর্ম বা জ্ঞান-চর্চা নিয়েও জীবনযাপন করতে পার। কিন্তু সে জিনিস আলাদা, আর যোগ করা আলাদা ! দুইএর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

যোগের পথ বেছে নিতে হলে তোমাকে গোড়া থেকে জেনেশুনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই তা নিতে হবে। প্রথমে জিনিসটা কী তাই জানতে হবে, তার পরে স্থিরসংকল্প হয়ে এ-পথে পা বাড়াতে হবে। সংকল্পটি একবার স্থির হয়ে গেলে তার পরে আর ইতস্তত: করা চলবে না। সুতরাং কেমন কাজটি বেছে নিচ্ছ সে বিষয়ে বেশ করে বুঝে নিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই তবে এ পথে নামা দরকার। যখন বলবে, "আমি যোগ করতে চাই", তার আগে পুরোপুরি ভাবে এর মানে বোঝা দরকার। তাই প্রসঙ্গ উঠলেও আজ পর্যন্ত আমি বিশেষভাবে এ-সম্বন্ধে কিছু বলিনি। অবশ্য সাধারণভাবে যোগের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি—কারণ তোমরাও চেয়েছ শুনতে, আর আমাকেও তাই বলতে হয় ; কিন্তু যা কিছু বলেছি তা নিতান্ত

সাধারণ ভাবে। কেউ যখন ব্যক্তিগত ভাবে এসে আমাকে জানিয়েছে যে আমি যোগ করতে চাই, তখন আমি বলেছি "আচ্ছা", (কিংবা নিষেধ করা দরকার হলে তখন বলেছি "না")। কারণ যারা যোগ করবে তাদের পক্ষে সব কিছুই হয়ে যাবে আলাদা ব্যাপার, তাদের জীবনের গতি ও বিশেষ ক'রে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সবই হয়ে দাঁড়াবে সাধারণের থেকে অন্য রকমের।

এক অদৃশ্য চেতনা এখানে সর্বদাই বিরাজ করছে। সে চেতনা সর্বক্ষণই তোমাদের ভিতরের অবস্থাকে শুধরে আনবার জন্য কাজ করছে : তাই অনবরতই সে তোমাদের চলবার পথে নানারকম বাধাবিঘ্ন এনে হাজির করছে, যাতে তোমরা নিজেদের যত দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতার মুখোমুখি হয়ে বারেবারে তার কাছে ঠোক্কর খেতে থাক। কিন্তু এ কেবল তাদেরই বেলায় যারা এই যোগের পথটি গ্রহণ করেছে। তারা ভিন্ন আর সকলের বেলাতে সেই চেতনা আলো দেবে, জ্ঞান দেবে, উন্নতি করবার প্রেরণাও দেবে, প্রত্যেকেই যাতে আপন কৃতিত্বের চরমে পৌঁছতে পারে সে চেষ্টাও করবে, সকল দিকেই যথাসম্ভব উন্নতি যাতে হয় তেমন সুযোগও এনে দেবে, কিন্তু যোগের পথে আসতে কাউকে ইঙ্গিত করবে না। সে বিষয়ে তোমাদের স্বাধীনতায় আদৌ হস্তক্ষেপ করতে চাইবে না।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসুক সম্পূর্ণ নিজের ভিতর থেকে। যোগ সম্বন্ধে সব কিছু জেনেশুনে স্বেচ্ছায় সচেতন হয়ে যারা এ-পথে আসবে, তাদের জীবনধারা অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ এক নতুন খাতে বইতে শুরু করবে, আর সেই জীবনই তাদের

তখন মেনে নিতে হবে—যদিও বাইরের দিক থেকে হয়তো বিশেষ কোন পার্থক্যই নজরে পড়বে না, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে সাধারণ জীবনের সঙ্গে তার বিস্তর ব্যবধান থাকবে। এ-পথের নিয়ন্ত্রণকারী চেতনার মধ্যে এমন এক একবোখা বেগ আছে যা কোনমতেই তোমাকে একটুও পথভ্রষ্ট হয়ে চলতে দেবে না: সামান্য একটু ভুল করে ফেললেই তখনই হাতে হাতে তার এমন ফল দেখিয়ে দেবে, আর তোমার কাছে তা এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যে তুমি কোনমতেই তাকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না।

তোমরা আমার সব ছেলেমেয়েরা, তোমাদের অনেকবারই বলেছি, আবারও বলছি যে, এখানে তোমাদের যতটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা অসাধারণ। বাইরের দিক থেকে সামান্য যা কিছু বাধানিষেধ আছে তা খুব অল্পই; তাও দরকার হয়েছে কেবল এই কারণে যে এই সীমাবদ্ধ জগৎটুকুর মধ্যে অনেককেই একত্রে থাকতে হয়, এখানে খানিকটা নিয়মের বাঁধন না থাকলে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে; কিন্তু ভিতরের দিকে আছে অবাধ স্বাধীনতা, কোন সামাজিক বাধ্যবাধকতা এখানে নেই, কোন নৈতিক কড়া নিয়ম নেই, ভয়ে ভয়ে হিসাব করে চলবার দায় নেই, কোন বাঁধা আইন মেনে কাউকে চলতে হয় না, এখানে থাকবার মধ্যে আছে কেবল একটি আলো; সেই আলোটিকে অনুসরণ করে যদি চল, তার ফলে যা লাভ হবার সে লাভ তোমার অবশ্যই মিলবে; আর সে লাভ যদি তুমি নাই চাও, তাও তোমার খুশি, সে স্বাধীনতায় কেউ হাত দেবে না।

কিন্তু যেদিন থেকে এই যোগের পথটি তুমি বেছে নিলে, প্রকৃতই যোগ করবে বলে যেদিন থেকে ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিজের মনে মনে এটি মনস্থ করে নিলে, সেদিন থেকেই জানবে যে ব্যাপারটি তোমার পক্ষে অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল। সামনে রয়েছে ঐ আলো, আর রয়েছে ঐদিকে এগিয়ে যাবার সোজা পথ, সেই পথেই তুমি চলতে শুরু করলে, তখন থেকে আর ও পথ ছেড়ে এদিক ওদিক দিয়ে চলবার উপায় নেই। এ জিনিস যেমন কাউকে ঠকায় না, তেমনি একেও কারো ঠকিয়ে যাবার উপায় নেই। যোগ মানে ছেলেখেলা নয়, এই কথাটি জেনে রাখবে। যখন এ রাস্তা বেছে নেবে তখন ভাল করে বুঝে নেবে যে কোন জিনিস তুমি করতে যাচ্ছ। একবার বেছে নিলে তখন এতেই তোমাকে লেগে থাকতে হবে, আর তার পরে দুমনা হওয়া চলবে না। অতঃপর সোজাই এগিয়ে চলা। এই হল কথা।

অপরপক্ষে সাধারণ ভাবেও তোমাদের কাছে এটুকু প্রত্যাশা করি যে তোমরা অন্য যা কিছুই কর তা মন দিয়ে করবে, যে কাজেই লাগ তাতে উন্নতি দেখাবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবে, নিতান্ত সাধারণ মানুষদের চেয়ে আরো খানিকটা উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা তোমাদের মধ্যে থাকবে। এখানে এসে রয়েছ এক বিশেষ আলোর পরিবেশের মধ্যে, এক চেতনাদীপ্ত ও সঙ্গতিকারক আবহাওয়াতে, এক মঙ্গলেচ্ছার আওতায় থেকে তোমরা মানুষ হচ্ছ। এর প্রতিদান স্বরূপ তোমরা জগতের মধ্যে সেই আলো এবং সঙ্গতি এবং মঙ্গলেচ্ছার কিছুটা অন্ততঃ সঞ্চারিত করবে, এ প্রত্যাশা করা ন্যায়সঙ্গত। তবেই তোমাদের এখানে থাকা কিছু সার্থক হবে।

কিন্তু এই রূপান্তরকামী যোগের সাধনাটি হল সকলের চেয়ে কঠিন কাজ—যার মনে হবে যে এই কাজই তার পক্ষে অভিপ্রেত, এরই জন্য সে পৃথিবীতে জন্মেছে, এ ছাড়া অন্য কিছুই তার করবার নেই, সেই কেবল এ-পথে আসবে। তাকে এর জন্য যদি অনেক মেহনত করতে হয়, অনেক রকমের কষ্ট সইতে হয়, অনেক বেশী লড়তে হয়, তবু সেগুলো তার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসবে না: "এ ছাড়া অন্য কোন কিছুই আমি চাই না" এই যদি প্রকৃত মনোভাব হয়, তবেই সে হল এর পক্ষে ঠিক কথা। নতুবা আমি তোমাদের সবাইকে বলি—এমনিতে স্বচ্ছন্দে তোমরা আনন্দে থাক, আর ভাল ভাবে থাক; সব কিছুই ভালভাবে বুঝতে শেখ, যথেষ্ট সুযোগ যখন পাচ্ছ তখন সাধারণের চেয়ে নিজেদের জীবনকে উচ্চতর ও মহত্তর ও সত্যনিষ্ঠ করে তোল, আর এই আলো ও মঙ্গল ইচ্ছা তোমাদের মাধ্যমে কিছুটা অন্ততঃ জগতে ছড়িয়ে পড়ুক।

* * * *

যোগে যে পূর্ণতা ও সিদ্ধি তোমরা চাইবে তা যেন ব্যক্তিগত-ভাবে শুধু তোমাদের নিজের জন্য বলে মনে করবে না, সবই চাই ভগবানকে অভিব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে, সব কিছুকেই ভগবানের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। যে যোগ তোমরা করতে চাইছ তা তোমাদের আপন লাভের জন্য নয়, কিংবা আপনাকে বড় করে তোলবার জন্য নয়, প্রকৃতপক্ষে তা হল ভগবানের দিব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য, তাঁরই ইচ্ছাকে পূরণ করবার জন্য।

যতক্ষণ তোমার মধ্যে ব্যক্তিগত ঈপ্সা, নিজস্ব কামনা,

অহংঘটিত বাসনাগুলি রয়েছে, ততক্ষণ যোগ করতে থাকলেও সে হবে মিশ্রিত জিনিস, তাকে ঠিক ভগবৎ ইচ্ছার অভিব্যক্তি বলা যাবে না। একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই যে ভগবান যা চাইছেন সেই ইচ্ছাই সফল হোক, তাঁরই অভিব্যক্তি হোক, তাঁরই বিকাশ হোক। তুমি হয়েছ সেই কাজেরই জন্য, তারই তুমি নিমিত্ত মাত্র, তা ছাড়া আর কিছু নয়। ওর মধ্যে যদি একটা আমিত্বের ভাব ঢুকে থাকে, যদি ব্যক্তিগত অহংচিন্তাটি সেখানে কাজ করতে থাকে, তাহলে বুঝবে যতটা তোমার হওয়া উচিত ততটা এখনও হতে পারনি। তা যে একবারেই হয়ে উঠবে, এমন কথা আমি বলছি না, তবে শেষ পর্যন্ত তাই খাঁটী কথা।

এই আধ্যাত্মিক মার্গে যারা ঢুকেছে, অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক জীবনই বেছে নিয়েছে—তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ শুরু করেছে ব্যক্তিগত কারণ থেকে, সে কারণ বহুবিধ রকমের : হয়তো কেউ দুঃখ পেয়েছে তাই সংসারে বিতৃষ্ণা এসেছে, কেউ-বা এ পথ বেছে নিয়েছে অধিকতর জ্ঞানের সন্ধানে, কেউ-বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নিজেকে বড় করে তুলতে চায়, কেউ-বা কিছু শিখে নিয়ে তার পর সকলকে শিখিয়ে বেড়াতে চায়, এমনি হাজার রকমের কারণে অনেকেই এই যোগের পথে আসে। কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁরই কারণে নিজেকে ছেড়ে দিলাম, তিনি আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করুন,—এই সোজাসুজি ভাবটা খুব অল্প লোকেরই থাকে। অথচ এই সোজা ভাবটি নিয়ে চললে তুমি সটান তোমার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পার, ভুল কাজ করবার কিংবা ভুল পথে যাবার

কোনই আশঙ্কা থাকে না। এ ছাড়া আর অন্য যা কিছু উদ্দেশ্য থাকবে সবই হবে মিশ্রিত জিনিস, সবই আমিত্বের ভেজাল মেশানো, তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে তোমাকে অনেক তফাতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবে।

তোমার অস্তিত্বের একটিমাত্রই সার্থকতা, একটিমাত্রই উদ্দেশ্য, তা হল ভগবানের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেওয়া, আর সে নিবেদন এমনই চূড়ান্তভাবে সত্যিকার হবে যে তোমাতে আর তাঁতে কোন প্রভেদ থাকবে না, নিজের মধ্যে আলাদা কোন ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া হওয়া পর্যন্ত থেমে যাবে: সেই হল আদর্শ মনোভাব, আর সেই মনোভাবটিই আনতে পারা চাই। এমন মনোভাব নিয়ে থাকলে তবেই জীবনের পথে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টকে অগ্রসর হতে পারবে, সব কিছু বাধাবিঘ্নকে জয় করে যেতে পারবে, এমন কি নিজের কবল থেকেও তুমি রক্ষা পাবে—কারণ সবচেয়ে মারাত্মক রকমের বিপদ আসে নিজেরই ভিতর থেকে, নিজেরই ব্যক্তিগত আমিত্বের তরফ থেকে।

নিয়ম ও শৃঙ্খলা

(এক)

তোমায় নিজের সম্বন্ধে রীতিমত সজাগ ও সচেতন হতে হবে, সকল দিক দিয়েই। তুমি তোমার আপন সত্তার জিনিস বলতে যা কিছুই বোঝ, তার সকল অংশকেই গুছিয়ে আনবে চৈত্য কেন্দ্রকে ঘিরে, কারণ সেই হল তোমার সত্তার ভিতরকার মূল দিব্যকেন্দ্র, তাহলে তাতেই তুমি সকল অংশ নিয়ে সুসমন্বিত এক চেতন পূর্ণসত্তায় পরিণত হবে, তখন কোন অংশের সঙ্গে কোন অংশের অসঙ্গতি থাকবে না। ঐ মূল কেন্দ্রটি পুরোপুরি ভাবেই ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত, সুতরাং তোমার সকল বিভিন্ন অংশই যদি ওর সঙ্গে মিল রেখে ওরই পাশে জড়ো হয়, তাহলে প্রত্যেকটি অংশই ভগবানে নিবেদিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সার্থকভাবে সংযুক্ত হতে পারবে। এই ভাবে তোমার ব্যক্তিসত্তাটি যখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, আর যখন ভগবানের তাই ইচ্ছা হবে, অভিপ্রেত সময় এসে যখন উপস্থিত হবে, তখন তোমার আমিত্বটুকু একেবারেই তাঁরই মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, তখন তুমি থাকবে শুধু তাঁরই কাজের জন্য। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করছে। তার আগে নিজের তরফের প্রস্তুতির কাজটি তোমায় সেরে রাখতে হবে, অর্থাৎ পূর্ণ এক চেতন সত্তা হয়ে আপন দিব্যকেন্দ্রে সংহত থেকে তাঁরই নির্দেশে যাতে চলতে পার তেমনিভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এখনকার অহংভাবের তৎপরতায় যখন তুমি আপন ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে

গিয়ে পৌঁছেছ, সে কাজটি যখন পাকা হয়ে গেছে, তখন তুমি ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, "এখন আমি প্রস্তুত, এবার কি তোমার কাজে লাগতে পারি?" ভগবান বলবেন, "হ্যাঁ"। তখনই জানবে যে তুমি সার্থক হলে। ভগবদ্‌ক্রিয়ার একটি যন্ত্রে পরিণত হলে। কিন্তু তার আগে এ যন্ত্রকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ঐভাবে গড়ে পিটে নেওয়া চাই।

তোমরা যখন স্কুলে যাও তখন তোমাদের নানারকম নিয়মে পড়া মুখস্থ করতে দেওয়া হয়, তাতে দেহেরও কষ্ট আর মনেরও কষ্ট আছে, কিন্তু তা কি অনর্থক তোমাদের শুধু কষ্ট দেবারই জন্য? তা নয়, যত কিছুই করানো হয় তাতে তোমাদেব মধ্যে একটা শিক্ষার আবহাওয়া তৈরি হতে থাকে, তোমাদের নিজেদের গড়ে ওঠার পক্ষে তা নিতান্তই দরকার। যদি নিজে নিজে এমন চেষ্টা করতে যাও যাতে পূর্ণভাবে গঠিত হয়ে উঠতে পার, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তেমন হতে না পারছ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনরকম কাজের ভার তোমাকে দেওয়া চলবে না। কিন্তু তোমাদের মত ছেলেমেয়েদের পক্ষে একজনেরও তেমন-ভাবে নিজে নিজে গড়ে ওঠার সাধ্য হবে না, কারণ কোথা থেকে কোনটা শুরু করতে হবে আর কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তার কিছুই তোমরা জানবে না। কেমন ভাবে জীবনযাপন করতে হবে তা গোড়াতে শিখিয়ে না দিলে কোন ছেলেমেয়েই তা আপনা থেকে শিখতে পারে না, তার দ্বারা কোন কিছুই আপনা থেকে শেখা সম্ভব হয় না। শিখিয়ে না দিলে এমনকি সামান্য প্রাথমিক জিনিসটাও সে আপনা থেকে করতে পারে না। প্রত্যেককেই যদি বিনা সাহায্যে নিজে নিজে ঠেকে শিখতে

হ'ত আর সেইভাবে আপন ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে হ'ত, তাহলে রীতিমত গড়ে ওঠার অনেক আগেই তার অন্তিমকাল এসে যেত। কাজেই এখানে তাদের পক্ষে অন্যের অভিজ্ঞতার সাহায্য পাওয়া দরকার। অনেক মানুষের অনেক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে জড়ো হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে যারা আয়ত্ত করে ফেলেছে তারাই শিক্ষা দিয়ে তোমাদের কাছে বলতে পাবে, "তাড়াতাড়ি যদি অগ্রসর হতে চাও, শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে যদি অল্পকালেব মধ্যে জানতে চাও—তাহলে এটা কর আর ওটা কর, অমুক বইটা পড় আর স্কুলে গিয়ে অমুক জিনিসটা শিখে নাও, খেলার মাঠে যেতে থাক।" তোমার যদি তেমন মেধা থাকে তাহলে একটু কিছু ধরিয়ে দিলেই তার থেকে নিজেকে গড়বার রাস্তা তুমি নিজেই খুঁজে পেয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে গোড়াকাব পাঠগুলি রপ্ত হওয়া চাই, কেমন ভাবে পায়ের উপর ভর কবে দাঁড়াতে হয় আর কেমন ভাবে হাঁটতে হয়, এটুকু হাতে ধরে শেখানো চাই। সেটা নিজে নিজে হয় না, প্রত্যেককেই তাই পরের কাছে শিক্ষা নিতে হয়।

(দুই)

এমন অনেক সব ছেলেমেয়ে আছে যারা বড়ই এলোমেলো অগোছালো। কোন কিছুই তারা শৃঙ্খলায় রাখতে জানে না। জিনিস কিছু পেলে তাও রাখতে পারে না, হয় হারিয়ে যায় নয়তো নষ্ট করে ফেলে। যার এমন স্বভাব হয় তার অনেক

কারণ থাকে। প্রথমতঃ, প্রায়ই দেখা যায় যে তার নিজের প্রাণশক্তি খুব কম। প্রাণের মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই যে একটু কষ্ট স্বীকার করে কোন জিনিসের যত্ন নেবে। দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কোন আগ্রহই তার জন্মায়নি ; সে হয়তো আপন মনের ক্রিয়া কল্পনা বা স্বপ্ন দেখা নিয়েই আছে। কিংবা হয়তো সে কোন বিষয়ে আদৌ সংযম কিংবা শৃঙ্খলা শেখেনি।

যে কারণেই হোক, ফল হয় একই রকমের। সব কিছু তার এলোমেলো। যখন পোশাক ছাড়বে তখন জামা কাপড়গুলো যেখানে সেখানে ছড়িয়ে দেবে, পড়া হয়ে গেলে বই, খাতা, দোয়াত, পেনসিল কোথায় ফেলে রাখবে তার ঠিকানাই থাকবে না ; আবার যখন সে সব জিনিস দরকার হবে তখন দুনিয়া হাতড়ে তা সংগ্রহ করতে হবে। এতেই তাদের বিশৃঙ্খল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কাজেই তাদের গোছ নেই ; কেবল বাইরের দিকে নয়, ভিতরের দিকেও তারা এমনি বিশৃঙ্খল। আবার এমন বয়স্ক মানুষও আছে যারা নিজেদের খুব বড় বলেই মনে করে, কিন্তু বাইরের কোন জিনিসের সম্বন্ধে তাদের যেন খেয়ালই থাকে না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ কথা বলেছেন যে জিনিসের যত্ন নিতে যারা না জানে তাদের জিনিস পাবার কোন অধিকার নেই, তারা কোন কিছু চাইতেই পারে না। এমন যারা হয় তারা কেবল আপন আমিত্বকে নিয়েই অস্থির, অথচ ভিতরে সবই এলোমেলো।

এমন মানুষও আছে যাদের ঘরদোরগুলি বাইরের থেকে

দেখতে বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, মনে হয় গোছালো। কিন্তু তাদের একটা কুলুঙ্গির মধ্যে উঁকি মেরে দেখ, কিংবা কোন ড্রয়ার টেনে দেখ, তাহলেই দেখবে সে যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র ; নানারকম জিনিসপত্র সেখানে একসঙ্গে স্তূপাকার করে ঠাসা। তাদের মগজের মধ্যেও ঠিক এমনি ব্যাপার, অল্প একটু জায়গার মধ্যে রাশীকৃত যত ভাবনা ও ধারণা ও কল্পনা, সমস্তই তাব কুলুঙ্গিতে রাখা জিনিসগুলোর মত একত্রে তাল পাকিয়ে আছে। সেগুলোর কোন শৃঙ্খলা নেই, স্বতন্ত্রভাবে সাজিয়ে রাখা হয়নি। এমনিই তাদের হয়ে থাকে, এর কোন ব্যতিক্রম দেখবে না। এমন মানুষ আমি একটিও দেখতে পাইনি যাব বাইবে বিশৃঙ্খলা কিন্তু মাথার ভিতরকার বুদ্ধিগুলি গোছালো। যে বাইরে এলোমেলো সে ভিতরেও তাই, যত কিছু বিপরীত ধারণা ও পবস্পববিরোধী অভিমত একই জায়গায় জট পাকিয়ে আছে, কোন সঙ্গতি বজায় রেখে সে জট ছাড়ান হয়নি, উচ্চতব মন নিয়ে তাব কোন সংশ্লেষণ করে দেখা হয়নি।

কোন মানুষকে চিনতে হলে তার সঙ্গে অনেক কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার হয় না, কেবল তার ঘরে ঢুকে আলমারিটা বা ড্রয়ারটা একবার খুলে দেখবে, তাতেই তোমার তাকে চেনা হয়ে যাবে। কিন্তু একজনের কথা আমি জানি— তাঁর নাম একটু পরেই বলছি—তিনি সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন রাশি রাশি বই আর কাগজপত্রের মধ্যে। তাঁর ঘরে ঢুকলেই দেখা যাবে চারিপাশে কেবল বই আর কাগজপত্র স্তূপাকার হয়ে আছে। কিন্তু দৈবাৎ তুমি যদি ভুল করে সেখানকার সামান্য একখানি কাগজ এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রেখেছ,

অমনি তখনই তিনি তা জানতে পারতেন, তার পরেই জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর ঘরের কাগজপত্র কে নাড়াচাড়া করেছে। সে ঘরে জিনিসপত্র এতই বেশি ঠাসা যে সেখানে ঢোকবার পর্যন্ত পথ খুঁজে পাবে না! কিন্তু সমস্তই আছে নির্দিষ্টভাবে সাজানো —চিঠিপত্র, লেখা কাগজ, বইগুলো, সবই রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গাতে—সুতরাং একটু কিছু এদিক ওদিক হলেই সে কথা তাঁর অগোচর থাকত না। এবার হয়তো বুঝতে পেরেছ, আমি বলছি শ্রীঅরবিন্দের কথা।

কিন্তু তোমরা যেন প্রাচুর্যের প্রশ্ন নিয়ে তাব সঙ্গে শৃঙ্খলার কোন গোলমাল করে ফেল না। তোমার ঘরে হয়তো অল্প কয়েকটি মাত্রই জিনিস আছে—হয়তো ডজনখানেক বই আর সামান্য কিছু জিনিসপত্র সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা কিছুই কঠিন কাজ নয়। কিন্তু অল্প কিংবা বেশি যেমনই থাক, তাতে একটা শৃঙ্খলা চাই, বেশিরকম জিনিস থাকলেও তা বুদ্ধি খাটিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে। এর জন্য সচেতন শৃঙ্খলাবোধ থাকা দরকার। দৈহিক অশক্ত না হয়ে পড়লে এ গুণটি আয়ত্ত করা চাই—অসুস্থ বা অপারগ হলে সে কথা আলাদা: কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। এমন শয্যাগত রোগীও দেখেছি যারা শুয়ে শুয়েই বলে: "অমুক ড্রয়ারটা খোল, তার ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কিংবা তলার দিকে অমুক জিনিস আছে দেখ।" নিজে নড়তে না পারলেও কোথায় কি আছে তা ঠিক জানে। আমি তাই বলছি যে শৃঙ্খলার দিকে সর্বদা নজর রাখবে, তাই হবে আদর্শ। মনে কর তোমার লাইব্রেরিতে হাজার হাজার বই আছে, কিন্তু বিষয় ভাগ করে আর বর্ণমালা অনুযায়ী

সমস্তই গুছিয়ে রাখ, তখন কোন বইএর নাম করলে দু'মিনিটেই তুমি তা বের করে দেবে। একা একজনের দ্বারা তা যদিও সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু আদর্শ হবে এই।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয়ে এমনি গোছালো হবে। পরকে অনুকরণ করা দরকার নেই, নিজের নিয়ম তুমি নিজেই ঠিক ক'রে নেবে, যা তোমার পক্ষে সব চেয়ে সহজ হবে—কিন্তু মোটের উপর একটা নিয়ম থাকা চাই, শৃঙ্খলা থাকা চাই।

জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করো

আভ্যন্তরীণ সত্তার উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতির কোন সম্পর্কই নেই। কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক এ-দুটি জিনিসের কখনো মিল থাকে না, দুই রাস্তা চলে দুই বিপরীত দিক দিয়ে: নৈতিক বিচারে খুব নিঃস্বার্থের মত কাজ করেও তুমি মনে মনে দারুণ অসুখী থেকে যেতে পার, আবার পুরো স্বার্থপরের মত কাজ করেও হয়তো নিশ্চিন্ত মনের সুখে দিন কাটাতে পার।

নৈতিক চেতনা আর সত্যধর্মী চেতনার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তোমাদের তাই আবারও বলছি যে নৈতিক চেতনা আয়ত্ত করার চেয়ে সত্য চেতনাকে আয়ত্ত করা অনেক বেশি কঠিন। যে কোন একজন মাথামোটা নির্বোধ মানুষ, যে সামাজিক নীতিগুলি সমস্ত জেনে নিয়ে হুবহু তার অনুসরণ করে চলেছে, তাকেই নৈতিক চেতনায় শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। কিন্তু সত্য চেতনা পেতে হলে অমন মাথামোটা কৌশল নিয়ে একেবারেই চলবে না, এই হল প্রথম কথা।

জীবনে যত কিছু বিপত্তি আসে, সমস্তই জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে নেবার অভাবে। তোমরা মুহূর্তের পর মুহূর্ত আর দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছ যেন গতানুগতিক ভাবে, যখন যেটা এসে পড়ছে তখন সেটাই করে যাচ্ছ। কিংবা মনের দিক দিয়ে একটা কিছু ধারা ঠিক করে নিয়ে তারই অনুসরণ করতে চেষ্টা কর, যদিও বাস্তবের সঙ্গে তার কোনই মিল নেই

কাজেই পদে পদে গণ্ডগোল বেধে যায়। কিন্তু তার বদলে যদি কোন উচ্চ আদর্শ ধরে নিয়ে সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত কর, সেখানে যদি অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ান না থাকে, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে কোনটা করবে আর কেমনভাবে করবে তার সঠিক নির্দেশ থাকে, তাহলে সব কিছুই সুশৃঙ্খলে চলে, বিপত্তির সম্ভাবনাই থাকে না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিজের উদ্দিষ্ট কাজটি বেশ করে যত্নের সঙ্গে বেছে নেবে এবং বুঝে নেবে, আর যতটুকু উত্তমরূপে সমাধা করতে পার ঠিক ততটুকুই করতে চেষ্টা করবে; তোমরা প্রায়ই বেহিসাবী রকমে অনেকখানি কাজ নিয়ে ফেল, আবার তার মধ্যেও এমন অনেক বাজে জিনিস এনে জোটাও যা কমিয়ে দিলে বা ছেঁটে বাদ দিলে মোটের উপর কোন ক্ষতি নেই। অবশ্য সকলেই যে এমন করে তা নয়, তবে আমি যেমন দেখেছি তাই বলছি। ভিতর থেকে যে স্বাভাবিক নির্দেশটুকু আসে তার দিকেই যদি অবহিত হও, আর বাইরের থেকে যখন যে ঢেউ আসছে তাতেই গা ভাসাতে গিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে না বেড়াও—তার মানে অন্য কেউ যখন যা বলছে তখন তাই করা, কিংবা বাইরের প্রত্যেকটি তুচ্ছ ঘটনাতে বিচলিত হয়ে সেই দিকে মাথা গলান, বিরুদ্ধ শক্তিদের ফুসলানিতে কান দিয়ে নিজের আসল কাজ হারান—এই সবের দ্বারা নিজের চলার পথ ভুলে বা অন্যমনস্ক হয়ে অনর্থক ঘোরাঘুরি না কর, যদি কারো কথায় কিছুমাত্র কান না দিয়ে আপন ভিতরের নির্দেশ অনুযায়ী অকুণ্ঠচিত্তে আপন গন্তব্য পথটিকে ঐকান্তিকভাবে অনুসরণ করতে থাক,

—তাতে অপরে যদি তোমার প্রতি বিমুখ হয় সে তাদেরই ক্ষতি,—তাহলে দেখবে যে তাতেই অবস্থা অনুকূল হয়ে আসবে, আর কম সময়ের মধ্যে অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে।

কাজের মধ্যে নিবিষ্টতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারলে সময়ের মাত্রা অনেকখানি কমিয়ে দিতে পারা যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা কাজ সারা হয়ে যায়। কেউ কেউ এমন আছে যারা কাজের মধ্যে বেশি রকম নিবিষ্টতা আনতেই পারে না, তা করতে গেলে অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ওটি হল অভ্যাসের ব্যাপার, যেমন ক্রমে ক্রমে ভারী ওজনের জিনিস তুলতে অভ্যাস করে নেওয়া যায়। তেমনি এই নিবিষ্টতা আনবার ক্ষমতাটিকেও ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করতে হবে। তার জন্য মনকে আগে অচঞ্চল করতে হবে, আর সেই অচঞ্চল মন নিয়ে অভিপ্রেত কাজটির মধ্যে অভিনিবেশ সহকারে একাগ্র-চিত্ত হতে হবে, তা সে যেমন কাজই হোক।

এই নিবিষ্টতা নিবিড় হয়ে আসতে পারে এক অতি শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ প্রেরণার জোরে, তার শক্তি যদিও নীরব কিন্তু খুবই প্রবল; সেই প্রেরণার জোরেই তুমি অবিচল মনে নিজের কাজে অগ্রসর হতে পার। যে কাজে তোমার এক ঘণ্টা লেগে যাবার কথা, ওরই জোরে তুমি তা সিকি ঘণ্টায় সেরে ফেলতে পার। এতে অনেকখানি সময় বেঁচে যায়। তখন তুমি একটা কাজ সেরে তখনই আবার অন্য কাজ না ধরে মাঝে কিছুক্ষণ পূর্ণ বিরতির বিশ্রাম নিয়ে নিতে পার। এই বিশ্রামে তোমার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিশ্রম থেকে

খানিক অব্যাহতি পায়, তাতে আবার কিছু নতুন শক্তির সঞ্চার হয়, এবং তার পরে আবার তুমি নতুন উদ্যম নিয়ে তেমনি নিবিষ্টতার সঙ্গে অন্যরকম কাজে লাগতে পার।

মায়ের জন্য করা

পড়াই হোক বা খেলাই হোক—যা কিছুই কর তার মধ্যে ভগবানের কথাটি স্মরণ রাখবে। তা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এটি করা দরকার প্রথমে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, যাতে উপরের দিব্যশক্তিকে গ্রহণ করার পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠতে পার, তার পরেও দরকার যাতে সেই শক্তি পেলে তুমি তা সকলের জন্য কাজে লাগাতে পার। সে তোমার ব্যক্তিগত কোন লাভের জন্য নয়, ভগবানেরই কাজের পক্ষে যাতে তৈরি হতে পার সেই জন্য।

অপরিহার্য রূপে এটাই করা দরকার। নইলে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমনি সাধারণভাবেই যদি থেকে যাও তো দেখবে অবস্থাটা কোনমতেই সন্তোষজনক হচ্ছে না, যতখানি শক্তি তুমি পেতে পারতে তা কিছুতেই তোমার আয়ত্তের মধ্যে 'আসছে না।

যেমন ধর যখন তুমি খুব লম্বা লাফ দিতে পারার জন্য কসরৎ করছ, তখন মনে করবে না যে তোমার নিজের বাহাদুরি বা আমোদ হবে বলেই ওটি করছ, মনে করবে যে তোমার শরীরটি ওতে আরো মজবুত ও সাবলীল হয়ে উঠবে, তাতে সেই শরীর ভাল ভাবে দিব্যশক্তিকে গ্রহণ করতে পারবে আর তারই কাজ ভাল ভাবে করবার পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠবে।

বস্তুতঃ যে কাজেরই অনুশীলন কর, তা এমনি মনোভাব নিয়েই করবে। নতুবা যে চমৎকার সুযোগটি তুমি পেয়েছিলে তা বিশেষ কোন কাজে লাগল না, যে অনুকূল অবস্থা এসেছিল

তা অবহেলায় নষ্ট করলে, তার থেকে বিশেষ কিছু ফল ফলাতে পারলে না।

সর্বত্রই রয়েছে এক মহাচেতনা, সে-ই রয়েছে সকল কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে, সকল রকম ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সে-ই চাইছে তার অভিব্যক্তি ফোটাতে। এখন তুমিও যদি অগ্রসর হয়ে তোমার তরফ থেকেও বল যে তোমার প্রয়াসের ও তোমার উন্নতির ভিতর দিয়ে সেই মহাচেতনার কাজই হতে থাক এবং তোমার ভিতর দিয়ে তারই বিকাশ হোক, এমন যদি তুমিও চাও তাহলে সে কাজটি আরো সহজে ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

এই হল এখানকার সবচেয়ে মূল কথা। তা যদি না হ'ত তাতেই বরং আমার আশ্চর্য লাগত। কারণ ঐ উদ্দেশ্য ছাড়া এমন একটা ব্যবস্থার মধ্যে তোমাদের এত জনের সমবেত হয়ে থাকার কোন মানে হয় না। এতে লাভ কি আছে? জগতে এমন হাজার হাজার কত স্কুল কলেজ আর ইউনিভার্সিটি রয়েছে, সেখানকার সুদক্ষ লোকজন আর শিক্ষার সরঞ্জামপত্র প্রভৃতি এখানকার চেয়ে অনেক বেশি। সেই সব জায়গা থাকতে তা ছেড়ে কেন যে এখানেই এসে জুটেছ, তার অবশ্য কিছু বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ এই যে এখানে তোমাদের সেই চেতনাটির মধ্যে তদ্গত হয়ে বিশেষভাবে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তবুও যদি তোমরা সেই চেতনাকে গ্রহণ করবার চেষ্টায় নিজেদের উন্মুখ করে না তোল, তাহলে যে সুযোগ এখানে মিলেছিল সেটিকে তোমরা নষ্ট করলে।

এ সম্বন্ধে কিছু কি তোমরা ভেবে দেখেছ? এখানেই যে তোমরা এসে পড়েছ তা কি এমনি শুধু হঠাৎ হয়ে গেছে, না তোমাদের বাপ মায়েরা দৈবাৎ এখানে পাঠিয়েছেন বলেই তাই, এর বদলে যদি অন্যখানে পাঠাতেন তবে সেখানেও এই ভাবে পড়াশোনা হ'ত? কথাগুলো নিজেরা একবার ভেবে দেখো। তের বছর বয়স হলে নিজে নিজেই এ সকল প্রশ্ন করা যায়, বিশেষতঃ তাদের পক্ষে যারা এমন জায়গাতে এসে পড়েছে যেখানে সব কিছুই নিতান্ত মামুলী ব্যাপার নয়। কেন যে তোমরা এখানে এসে রয়েছ, এর প্রকৃত কারণ কি, ভিতরকার উদ্দেশ্য কি?

তোমাদের নিজেদের মনে যদি আপনা থেকেই এ প্রশ্ন জেগে থাকে, তাহলে নিশ্চয় নিজেদেরই অন্তরের মধ্যে কোথাও এর জবাবের সন্ধানও করেছ। সে জবাব তোমাদের নিজের মধ্যেই আছে, বাইরে কোথাও নয়। অন্তরের গভীরে প্রবেশ করলে সেখান থেকে যে পরিষ্কার জবাবটি পাবে তা খুবই চমকপ্রদ। সেই গভীরে ঢুকলেই দেখবে সে খুবই নীরব জায়গা, বাইরের সমস্ত কোলাহল সেখানে স্তব্ধ, কেবল দেখবে যে সেখানে একটি শিখা জ্বলছে, যার কথা আমি অনেকবারই বলেছি। আর সেই শিখার মধ্যেই দেখতে পাবে কোনদিকে তোমার ভবিষ্যৎ নিয়তি। তখন দেখবে, অসংখ্যবার জন্মের পর জন্ম নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে তোমার যে আস্পৃহা এতকাল পর্যন্ত জের টেনে এসেছে, সে আজ কোন সিদ্ধিলাভের দিকে তোমাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত যতখানি প্রস্তুত হয়েছ এর জন্য হয়তো তোমার

হাজার হাজার বছর সময় লেগে গেছে, এবার তুমি চলেছ তার আসন্ন সার্থকতার দিকে।

খুব গভীরে তলিয়ে যখন এই জিনিসটা উপলব্ধি করবে, তখন দেখবে যে তোমার যা কিছু অক্ষমতা, দুর্বলতা, নাস্তিকতা, বোকামি রয়েছে, এর কিছুই তোমার নিজের নয়, এই তোমার যথার্থ পরিচয় নয়; এগুলো তোমার একটা বাহ্য খোলস, যা তোমার গায়ে ফিট্ না করলেও অবস্থাচক্রে পড়ে সাময়িকভাবে গায়ে জড়িয়ে আছ মাত্র। তাই বলে তোমার প্রকৃত পরিচয় তাই নয়।

কিন্তু ঠিক কথা কোনটি তা তো জানা চাই। এখন তার যে সুযোগ পেয়েছ তাকে যদি সার্থক করতে চাও, জন্ম জন্মের আস্পৃহাকে যদি সফল কবে আনতে চাও, অনেক আগের থেকে যা হতে চাইছিলে তাই যদি হতে চাও, তাহলে অল্পে অল্পে তোমাকে আলোর দিকে, চেতনার দিকে, সত্যের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, তোমার ঐ বাইবের খোলসটির নানা অন্ধকার অংশগুলির মধ্যে সেই উপরের আলো এনে ফেলতে হবে। সেই আলোতে তুমি স্পষ্টই তখন বুঝতে পারবে যে কোন উদ্দেশ্যে এখানে তুমি এসেছ, আর শুধু বোঝাই নয়, যে কাজের জন্য আসা তাও সার্থকভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবে।

কত কত শতাব্দী ধরে এই জিনিস তোমার মধ্যে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, সে তোমার এখনকার এই দেহাধারটির মধ্যেই নয়, কিন্তু তোমার যে আসল সত্তা রয়েছে তারই মধ্যে; কত শতাব্দী ধরে তা এখনকার এই বিশেষ সুযোগটুকু পাবার

প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে ছিল। এখন বুঝতে পারছ, এ কতখানি চমকপ্রদ কথা! তুমি বহু যুগ আগের থেকে যে আশাটি নিয়ে রয়েছ, যার জন্য তুমি কতই প্রার্থনা করেছ, কতই পরিশ্রম করেছ, সেই আশাই এখন সম্পূর্ণভাবে সফল হবার সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। এ এমন এক আশ্চর্য সময় যখন অনেক কিছু বড় বড় ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। এখনকার এমন অমূল্য সুযোগ কারো নষ্ট হতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

সঙ্কল্প ও ইচ্ছা

ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের মধ্যে প্রভেদ কি ?

এ দুটি ঠিক এক জিনিস নয়। মনে কর প্রথমে তুমি ভাবলে যে অমুক কাজটা আমার করা উচিত, এটা করলে ভাল হবে, তার মানে তোমার বুদ্ধি তাই নিয়ে বিচার বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্ত করছে; তার পরে আসবে সঙ্কল্প, সে তাই নিয়ে কাজ শুরু করবে, সে পক্ষে যেমন যেমন করা দরকার তাই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। তাহলে সঙ্কল্প হল কর্মোদ্দীপক শক্তি, তোমার নিজের দ্বারাই হোক বা কোন উচ্চতর শক্তির দ্বারাই হোক—যা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাকেই কাজে পরিণত করতে শুরু হবে সঙ্কল্পের ক্রিয়া। সে এক সংযোজিত ও সুব্যবস্থিত ক্রিয়া: পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বিশেষ নির্দিষ্টভাবে পূর্ণসংযত হয়ে কাজ করে। ইচ্ছা জিনিসটা ঠিক তাই নয়, সে কাজ করে এক একটা ঝোঁকের বশে। এমন অনেকেই আছে যাদের ইচ্ছা জিনিসটার কোন অভাব নেই, কিন্তু সঙ্কল্প বলতে আদৌ কিছু নেই; তাদের সম্বন্ধেই বলা হয় যে কেবল মনের ইচ্ছাগুলিই তাদের মাটি করে দিয়েছে। ইচ্ছাকে কাজে সফল করবার মত সঙ্কল্পশক্তি যদি তোমার না থাকে, তাহলে কেবল ইচ্ছা নিয়েই যেখানে ছিলে সেখানে রয়ে গেলে, এক পাও এগোতে পারলে না। কারো কারো মধ্যে যেটুকু সঙ্কল্পশক্তি মজুত আছে তাই তাদের ইচ্ছাকে সফল করবার কাজে লাগে। সঙ্কল্প রূপ যে

শক্তি, তার একটা প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থা আছে, তাকে সকল উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা যায়।

তোমার সঙ্কল্পশক্তি আছে মানেই কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য লেগে থাকাব মত যে উদ্যম দরকার তা তোমার আছে। অপর পক্ষে ইচ্ছা জিনিসটা হল ঝটিতি আসা একটা আবেগের মত, দপ্ করে জ্বলে ওঠে কিন্তু তখনই আবার নিবে যায়, স্থায়ী হয় না প্রায়ই। অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকার মত সুব্যবস্থাব ভাব তার মধ্যে নেই। এই ইচ্ছাতে যখন্ পেয়ে বসে, তখন সে তোমাকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ যা খুশি তাই করাতে পারে, কিন্তু তা শুধু হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়, কোন সঙ্গত বা সুব্যবস্থিত ভাবে নয়।

এটা ওটা জিনিস পাবার জন্য ছেলেদের এত ইচ্ছা হয় কেন ?

তার কারণ তারা বাসনাতে ভরা থাকে। হয়তো তার হেতু এই যে তারা বিশ্বের বাসনা তরঙ্গের প্রভাব সঙ্গে নিয়েই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিল, আর শিশুকালে সংযম চেতনাটি না আসায় কোন বাসনাকে তারা চেপে রাখতে পারে না, যখন যেটি ইচ্ছা জাগে তখনই তা মুখ ফুটে বলে ফেলে। বড়রাও অমনি বাসনাতে ভরা, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে লজ্জা বোধ করে বলে তারা সে কথা কাউকে জানতে দেয় না। লোকে কি ভাববে, এই ভয়ে তারা সেগুলিকে লুকিয়ে রাখে। ছেলে-মেয়েদের মন বড়দের চেয়ে সরল ও দ্বিধাশূন্য; কোন কিছু নেবার ইচ্ছা হলে তারা তখনই তা খোলাখুলি চেয়ে বসে। নিজেদের মনের ইচ্ছাকে যে প্রকাশ করা অনুচিত কিংবা অন্যায়

এতটা তারা ভাবে না। বুদ্ধি তাদের ঐভাবে কাজ করে না। আর যারা পরিণত মানুষ, তাদেরও মনে সর্বক্ষণই বাসনা জাগছে, কেবল তারা তা বাইরে প্রকাশ করে না, এমনকি কখনো-বা নিজের কাছেও স্বীকার করে না। কিন্তু এটি ওটি পাবার বাসনা সর্বদাই জাগছে মনের মধ্যে। যেমনি কিছু সুন্দর জিনিস দেখবে, অমনি সেটি তোমার নেবার ইচ্ছা হবে। নিতান্তই ছেলেমানুষি ইচ্ছা, এমনকি তা হয়তো উপহাস্য। যা পেতে ইচ্ছা করা যায়, শতকরা নিরানব্বুই জনই তা পায় না। কিন্তু তার মধ্যে একজন যদিও পায়, সেই ভাগ্যবানদের মধ্যেও ক'জনই-বা সে জিনিস পাবার পরে তার মর্যাদা বোঝে? ছেলেরা আবার সে পক্ষে আরো বেশি অমনোযোগী। তারা যা চাইছে সেটি দিয়ে দেখ, যেমনি পাওয়া হয়ে গেল তারপর সেদিকে আর ফিরেও চাইবে না।

ছেলেদের এ স্বভাব কেমন করে ঘুচতে পারে?

তার একাধিক উপায় আছে। প্রথমতঃ, এটি বিবেচনা করা দরকার যে তারা মনে যা ভাবছে কিংবা অনুভব করছে তা অকপটে প্রকাশ করা তাদের থামিয়ে দেওয়া উচিত কিনা। লোকে কিছু না ভেবে সাধারণতঃ তাই করে থাকে। তারা ছেলেদের এমন ধমকায় আর শাসন করে যে তার থেকে সকল ইচ্ছাকে গোপন রাখাই তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু ওতে আসল রোগটি সারে না। তুমি বরাবরই যদি কোন শিশুকে বলতে থাক, "ও জিনিসে হাত দিও না, ও তুমি পাবে না," তাহলে তার মনে এই ধারণাটি তৈরি হয়: "আচ্ছা, আমি

এখন ছেলেমানুষ আছি বলেই কোন কিছু নিতে পাব না, কিন্তু এর চেয়ে একটু বড় হয়ে উঠি, তখন যা খুশি তাই নিতে পারব, তখন কে আমাকে আটকাবে"। তাই বলছি, অমন করে দাবিয়ে রাখাতে তো রোগ সারান হল না ; ছেলেদের মানুষ করে তোলা অত সহজ কাজ নয়। এর চেয়ে অন্যরকম উপায় হল, যা চাইছে তাই তাকে নিতে দেওয়া। কিন্তু তারও আবার মুশকিল আছে এই যে একটা জিনিস পেলেই সে আবার অন্য একটা চেয়ে বসবে, তার চাওয়ার কোন শেষ থাকবে না। বাসনার নিয়মই হল তাই, দিয়ে তাকে কোনমতে খুশি করা যায় না। তাই তোমাকে পদ্ধতিটা একটু বদলাতে হবে। যদি সে বুদ্ধিমান হয় তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, "তুমি যা চেয়েছিলে তাই পেলে বটে, কিন্তু দেখছ তো, যেমনি পাওয়া হয়ে গেল অমনি ওটিকে অবহেলা করতে শুরু করলে, এখন আবার ওটিকে ছেড়ে অন্য একটি চাইছ। আবার এটাও যখন পাবে তারপর ঠিক এই রকমই করবে"। কিন্তু সে ছেলে যদি চালাক হয়, তাহলে তার জবাব এই হবে : "কিন্তু সব সময় যা চাইব তাই যদি সব সময়ই পেতে থাকি তাহলে তো এই চাওয়া রোগটাই সেরে যাবে"।

এই রকম ধারণাই অনেকের মনে সারাজীবন থেকে যায়। তাদের যখন বাসনা জয়ের কথা বলা হয়, তখন তারা বলে, "বাসনা জয়ের সব চেয়ে ভাল ওষুধ হল, যখন যে ইচ্ছাটি জাগছে তখনই তা পূরণ করে ফেলা"। কিন্তু তাতে বাসনার বিষয়বস্তুই বদলায় মাত্র, কিন্তু আমরা কেবল তাই চাইছি না, আমরা চাইছি ঐ বৃত্তিটাকে এবং ওর ঝোঁকটাকেই বদলে দিতে।

এর জন্য আসা চাই কিছু জ্ঞান, বোধশক্তি এবং অনুভূতি। ছোটদের বেলায় তা প্রত্যাশা করা যায় না। প্রথমতঃ, তাদের অতখানি বোঝবার শক্তি নেই, আর তুমি এ কথা বুঝিয়ে বললেও তারা বুঝবে না। তাই তাদের বাপমায়েরা সে চেষ্টা করতেই যায় না। তারা এক কথায় থামিয়ে দেবার জন্য ধমক দিয়ে বলে—"যাও, এখন বিরক্ত কর না"। এই উপায়ে ব্যাপারটিকে তারা এড়িয়ে যায়।

কিন্তু ওতে কোন মীমাংসা হল না। কাজটি খুবই কঠিন, তার জন্য অবিরাম চেষ্টা আর অবিচল ধৈর্যের দরকার। অনেক মানুষই এমন আছে যারা এখন আর শিশু নেই, তবু সারাজীবন ধরেই সেই আগেকার অভ্যাসটি তাদের রয়ে গেছে: যুক্তির কথা কখনও তারা বুঝবে না। যদি দেখিয়ে দিতে যাও যে তারা অবুঝ হচ্ছে, চিরদিনই বাসনার পূরণ হতে থাকবে এ কখনো সম্ভব নয়, তারা সে কথায় কান না দিয়ে এই শুধু ভাববে: "কড়া কড়া কথা বলে সমালোচনা করাই এদের স্বভাব, আদৌ শিষ্টতা জানে না"। এই ভেবেই চুপ করে থাকবে।

ছেলেবয়স থেকে এই চেষ্টা করা উচিত যাতে বাসনার ধারাটি তাদের বদলে যায়। সামান্য জিনিসের বদলে আরো ভাল কিছুর জন্য কামনা করতে শেখে, এমন কিছু যার প্রকৃত সত্যমূল্য আছে, আর যে কামনাকে পূরণ করা আরো বেশি কঠিন। যখন তুমি দেখছ যে অমুক শিশুটির মধ্যে চাহিদাবৃত্তি খুব প্রবল, তখন তাকে তুচ্ছ ছোট জিনিসের বদলে বড় জিনিস চাইতে শেখাও, যাতে কেবল সাময়িক তৃপ্তি হয় এমন

ক্ষুদ্র জিনিসের বদলে উঁচুদরের জিনিসের জন্য কামনা জাগিয়ে দাও, যেমন ধর, নতুন কিছু জানবার বাসনা, শেখবার কামনা, বড় স্থান অধিকাব করবার কামনা, ইত্যাদি। এই ভাবেই শুরু করলে তাতে ভাল ফল হবে। এই সকল কামনাকে পূরণ করা তো অনেক বেশি কঠিন, কাজেই ঐদিক দিয়ে কামনা জেগে উঠলে তখন ইচ্ছাশক্তির মাত্রাটাও বেড়ে যাবে। আর যদি এমন ঔৎসুক্য জাগাতে পার যার আশু নিবৃত্তি করা কিছু কঠিন, যেমন তাকে একটা পুতুলেব মূর্তি গড়তে বললে, একটা চীনা ধাঁধাব সমস্যাপূরণ করতে দিলে, পেশেন্স খেলার জটিলতার মধ্যে ঢুকিয়ে তাব মীমাংসা করতে শিখতে বললে, তাতেও কাজ হবে, তাতে তার মনেব একাগ্রতা বাড়বে, অধ্যবসায় বাড়বে, ধারণাশক্তি বাড়বে, ইত্যাদি। এই ভাবে ওদের ইচ্ছাপূরণের ঝোঁকটিকে মন্দ দিক থেকে ভাল দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে পার। অবশ্য তোমাকেও এর জন্য কিছু মেহনত করতে হবে আর ঐ নিয়ে লেগে থাকতে হবে, কিন্তু এতে নিশ্চিত সুফল মিলবে। সহজ উপায় না হলেও এতে সব চেয়ে বেশি কাজ হবে।

"না" বলে হাঁকিয়ে দিলেও এ রোগ সারে না, "আচ্ছা" বলে প্রশ্রয় দিলেও সারে না। আমি কয়েক ব্যক্তির কথা জানি, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের যা খুশি তাই করতে প্রশ্রয় দিত। ওর মধ্যে এমন একটি ছেলে ছিল, সে যা পেত তাই মুখে পুরে খেয়ে ফেলত। এর ফলে তাকে প্রায়ই রোগে ভুগতে হ'ত, ভুগতে ভুগতে সে আপনা থেকেই এ বদভ্যাস ছেড়ে দিল। কিন্তু এমন স্বাধীনতা দেওয়ার যথেষ্ট বিপদ আছে। যেমন, একটি

ছেলে একদিন এক দেশলাই-এর বাক্স দখল করলে, কেউ তাকে বাধা দিল না, তাই নিয়ে খেলা করতে গিয়ে নিজের দেহের খানিকটা অংশ হঠাৎ পুড়িয়ে ফেলল, যদিও তার পর থেকে দেশলাই আর সে ছোঁয়নি। এমন ধরনের প্রশ্রয় দেওয়া মারাত্মকও হতে পারে। কারণ ছেলেরা প্রায়ই বেপরোয়া হয়—অধিকাংশই তাই—একটা কিছু খেয়াল ধরলে দুনিয়ার কোন বাধাই তখন গ্রাহ্য করে না। কারো-বা ছাদের আলিসার কানায়-কানায় কিংবা চালাঘরের মটকার উপর ঘুরে বেড়ানোর খেয়াল চাপে; কেউ-বা জল দেখলেই তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। এমনও ছেলে আছে যারা রাস্তায় গাড়ি আসছে দেখলে তখনই ছুটে পার হতে যাবে। এই সব ছেলেদের যদি ইচ্ছামত চলতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে একসময় ওতে মৃত্যুও ঘটতে পারে। অভিভাবকেরা কেউ কেউ অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে এই সব বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নেন। তাঁরা বলেন যে আটক রেখে ওদের ভাল করা যাবে না। কাজটা ভাল নয় বলেই যে ওদের নিষেধ করা হচ্ছে এ কথা ওরা বিশ্বাসই করবে না, মনে করবে যে নিষেধ মানাবার জন্যই সেটাকে খারাপ কাজ বলা হচ্ছে। তাঁরা এই যুক্তি দেখিয়ে তর্ক করে বলেন যে, তার চেয়ে বরং ওদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়াই কি ভাল নয়? তাঁদের থিওরিটা এই যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখতে দিতে হবে, তাতে যা হবার হোক। জগতে যারা নতুন অভিজ্ঞতা নিতে এসেছে তাদের ঘাড়ে আমাদের পুরানো অভিজ্ঞতার বোঝা চাপাবার দরকার নেই। তারা নিজেরাই ঠেকে শিখে নিজেদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করুক। একবার এক জায়গাতে আমি বলেছিলাম যে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে ছেলেদের একটু সামলে রাখা উচিত, তার জবাব এই পেলাম যে ও কথা বলার অধিকারই আমার নেই। যখন তবুও বললাম যে একটু সাবধান না কবলে ছেলেটি বেঘোরে মারা যেতে পারে, তার জবাবে বললে—"তাতেই-বা কি করা যাবে? যার যেমন নিয়তি তা হবেই। কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। যে বোকামি করবে সে নিজেই তার ফল পাবে, তখন নিজের থেকেই শিক্ষা হবে, জোর করে শেখানোর চেয়ে তা শতগুণে ভাল।" তবে এমনও দেখা যায় যে ঐ রকম শিক্ষায় যথেচ্ছাচার থামে বটে, কিন্তু যে ভাবে প্রত্যাশা করা যায় তেমন ভাবে নয়।

এখানে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা থিওরি বাৎলাতে গেলেই জিনিসটা আরো জটিল হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের বেলাতেই তদুপযোগী ব্যবস্থা করতে হয়, আর এই নিয়ে সারাজীবনই লেগে থাকতে হয়।

চিহ্ন ও প্রতীক

কথায় বলে, উল্কাপাতের সঙ্গে সঙ্গে কোন সঙ্কল্প করা হলে তা নিশ্চয়ই ফলবে। এ কি ঠিক কথা ?

তার মানে, যেমনি উল্কাপাত হতে দেখছ অমনি সেই মুহূর্তেই তোমার মনের আস্পৃহাটিকে আকার দিতে হবে। এখন, ঐ স্বল্প মুহূর্তের মধ্যেই যদি তোমার আস্পৃহাটি সচেতন আকার নিয়ে প্রকাশ পায় তার অর্থই হল এই যে অনেক আগের থেকেই তা তোমার চেতনাতে হাজির ছিল। অবশ্য এমনটি কেবল আধ্যাত্মিক আস্পৃহার বেলাতেই হতে পারে, সাধারণ জীবনের কোন বিষয়ে নয়। তাই বলছি, উল্কা খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি মন থেকে আস্পৃহার কথাটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে, তখন বুঝতে হবে যে তা তোমার চেতনার মধ্যে প্রধান হয়ে সামনেই হাজির ছিল। আর যে চিন্তা চেতনাকে অমন ভাবে সর্বক্ষণ অধিকার করে থাকে, তা যে শীঘ্রই সফল হবে সে ঠিক কথাই।

আমি নিজেও এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তার ফলও পেয়েছি। যে কথা তুমি বললে তাই হয়েছিল। একটা উল্কাপাত হতে দেখে ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আমার অন্তর থেকে এই কথা বেরিয়ে এল : ভগবানের সঙ্গে আমার দেহের মিলন চাই। আর বছর পূর্ণ হবার আগেই তা বাস্তবিক ঘটে গেল।

অবশ্য উল্কাপাতই তার কারণ নয়। ঐ কথাই সর্বক্ষণ আমার মনে জাগরূক ছিল, ও ছাড়া অন্য কোন ভাবনাও ছিল

না কামনাও ছিল না, ও ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজও আমি করতাম না। ও সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করতে সারাজীবনই কেটে যায়, সবাই বলে যে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বছর তো লাগবেই। কিন্তু আমার তা বার মাসেই হয়ে গেল।

তার কারণ আমার আস্পৃহাকে এমন একাগ্র করে তুলেছিলাম যে উল্কা খসার সঙ্গে সঙ্গেই এক লহমার মধ্যে তা প্রকাশ হয়ে পড়ল—আবছা ভাবে নয়, স্পষ্টই ঐ কথাগুলি বেরিয়ে এল : ভগবানের সঙ্গে আমার মিলন চাই। এখানে উল্কা বড় কথা নয়, আস্পৃহাটিই বড় কথা। শীঘ্র সাফল্য পেতে উল্কাপাতের সুযোগ নেবার দরকার হয় না, সমগ্র সত্তা যদি সাগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকে তাতেই কাজ হয়।

ব্যথা ও ঘুম

শরীরে যখন খুব ব্যথা পাচ্ছি তখন ঘুম আসবে কেমন করে?

তা হতে পারে একরকম যোগশক্তির সাহায্যে। সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হল সেই সময়ে নিজের দেহের মধ্যে জড়িয়ে না থেকে দেহ থেকে সরে দাঁড়ান।

শরীরের মধ্যে যখন কিছু কষ্ট উপস্থিত হয়েছে, যেমন মনে কর তোমার প্রবল জ্বর হয়েছে, কিংবা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তখন সেই কষ্টকে এড়াবার একমাত্র উপায় হতে পারে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এলে, অর্থাৎ নিজের প্রাণসত্তাকে দেহ থেকে স্বতন্ত্র করে দিলে। তুমি যদি যোগী হও আর এই উপায়টি তোমার জানা থাকে, তাহলে দেহ ছেড়ে তার তফাতে থেকে তুমি তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তোমার প্রাণসত্তা যদি দেহ থেকে এমনি স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তফাৎ থেকে নিজের দেহটাকে আলাদা ভাবে তখন নিজেই দেখতে পাবে। আর তখন তুমি আপন চেতনা ও শক্তির দ্বারা দিব্য-শক্তিকে আকর্ষণ করে দেহের যেখানটি পীড়িত সেখানে তার তেজরশ্মি প্রয়োগ করতে পারবে। এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এতে তোমার রোগটি নিশ্চয় সেরে যাবে। তেমন শক্তি ও বিদ্যা যদি তোমার থাকে তাহলে এ উপায়টি একেবারে অকাট্য। এর দ্বারা যে কোন রোগকেই তুমি অল্প সময়ের মধ্যে নিজে নিজে সারিয়ে ফেলতে পার। কিন্তু এর জন্য যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই এবং শিক্ষা থাকা চাই। নিজে নিজে এ জিনিস শেখাও যায় না বা জানাও যায় না।

তবে যন্ত্রণা যখন খুব অসহ্য হয়, সেই চরম অবস্থাতে মানুষ আপনা থেকে এই ধরনের একটা উপায় করে নেয়; তারা তখন মূর্ছা যায়। মূর্ছা যাওয়া মানেই দেহের ভিতর থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া। যাদের দেহের বন্ধন খুব দৃঢ় নয় তারা বেশি কষ্ট পেলেই অমন করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তুমি দেহটিকে অসাড় জড়পদার্থের মত ফেলে রেখে ঐভাবে বেরিয়ে গেছ, তখন সেই দেহের কাছাকাছি যারা রয়েছে তাদের পক্ষে একটু বিবেচক ও বুদ্ধিমান হয়ে কাজ করা দরকার। সে সময়ে তোমার চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য জোর করে ঝাঁকানি দিতে থাকা উচিত নয়। তারা যদি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে শুরু করে, তার ফল ভাল না হয়ে বরং আরো খারাপ হতে পারে। ঐ সব করার বদলে যদি ধীরে ধীরে আপনা থেকে মূর্ছাটি ছেড়ে যাবার জন্য খানিক অবসর দেওয়া হয়, তাহলে একটা স্বাভাবিক শান্তির ভাব আপনা হতেই আসে, তখন আর দেহের কষ্ট চেতনাকে পীড়ন করে না। ঐরূপ ফিটের অবস্থাতে দেহ ক্রমশঃ স্থির ও নিশ্চল হয়ে আসে, তাতে কষ্টের কারণটি বর্তমান থাকলেও দেহ কিছু বিশ্রাম পায়।

যাই হোক, কষ্ট এড়াবার জন্য ওর চেয়ে আরো অপেক্ষাকৃত নীচু দরের উপায়ও আছে, তাতে সাফল্য যদিও কিছু কম মেলে। সেগুলিও খুব সোজা উপায় নয়। সে উপায় এই যে শরীরের যেখানটিতে যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে তার সঙ্গে তোমার মস্তিষ্কের যোগাযোগ কেটে দেওয়া। অর্থাৎ মস্তিষ্ক যেন আর সেখান থেকে কোন ব্যথাবোধের স্পন্দন না পায়, সুতরাং সেই

জায়গাতে ব্যথার কাজ হতে থাকলেও মস্তিষ্কে তা অনুভব হবে না। বস্তুতঃ ডাক্তারেরা যখন দেহের কোন একটা অংশকে অসাড় করে দিয়ে অপারেশন করে, তখন তারা এমনি উপায়ই প্রয়োগ করে। দূষিত অংশটির চতুর্দিকে যে নার্ভের তন্তুগুলি আছে, তাকে তারা ঔষধের দ্বারা এমন নিষ্ক্রিয় করে ফেলে যে সেখানকার কোন ব্যথাই তুমি বোধ করবে না, কিংবা অতি সামান্যই বোধ করবে। কিন্তু এর বেলা তোমাকে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও চেতনাশক্তির জোরেই সে কাজ করতে হবে ; তার জন্য এক রকমের গুহ্যশক্তি আয়ত্ত করা দরকার। কেউ কেউ আপনা থেকেই এমন করতে পারে, কিন্তু তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। এতটা পর্যন্ত তুমি যদি নাও পার, তাহলে আরো এক উপায় আছে, যা তোমাব আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারে এবং আসা উচিত। নিজের দেহের ব্যথা বা যন্ত্রণার দিকেই মনোনিবেশ করে সর্বদা ওতেই একাগ্র হয়ে থাকবে না ; ওদিক থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে তাকে অন্য দিকে নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করবে। ব্যথার কথা যতই বেশি ভাববে ততই তা আরো বেশি জোরে করতে থাকবে। যদি কেবল তারই স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে থাক, কখন ব্যথাটা বাড়ছে কমছে সেই দিকেই লক্ষ্য করতে থাক, তাহলে তাকে তুমি তো আহ্বান করেই নিচ্ছ, যাতে তা আরো লেগে থাকে সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রশ্রয়ই দিচ্ছ। তাই বলছি, তেমন অবস্থাতে হাল্কা ধরনের কিছু বই নিয়ে পড়তে থাকবে কিংবা অন্য কাউকে পড়ে শোনাতে বলবে, যাতে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পার।

আর ঘুমের পক্ষে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হল পূর্ণ বিশ্রামের

অবস্থাতে চলে যাওয়া, অর্থাৎ এমন বিশ্রাম যাতে দেহেও আসবে নিশ্চলতা, সেই সঙ্গে প্রাণেও শান্তি এবং মনেও নিস্তরঙ্গ স্থিরতা, যাতে সমগ্র সত্তার চেতনা সব কিছু বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে সচ্চিদানন্দে প্রবেশ করতে পারে। এটি যদি আয়ত্ত করতে পার তো দেখবে নিদ্রাভঙ্গের পরে অসাধারণ স্ফূর্তি ও নির্মল আনন্দ নিয়ে তুমি জেগে উঠেছ। কিন্তু এ অবস্থাতে পৌঁছতে পারাও সহজ নয়, যদিও তা অসম্ভব কাজ নয়। ঘুমের পক্ষে এই হল আদর্শ জিনিস।

সাধারণপক্ষে এমন কখনই হয় না; প্রায়ই দেখা যায় যে নানারকম এলোমেলো মানসিক তৎপরতা লেগে থাকায় সমস্ত ঘুমটাই নষ্ট হল; বিছানায় শুয়ে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করলে, হাত-পা ছুড়লে, কত কি বকলে, এমনকি হয়তো চেঁচিয়েও উঠলে। ঘুমোতে গিয়ে বিশ্রাম বিশেষ কিছুই মিলল না।

ঘুমের সময় প্রায়ই স্বপ্নের পর স্বপ্ন দেখা চলতে থাকে, যা নিতান্ত মূল্যহীন ও ক্লান্তিকর, বিশ্রামের তাতে যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। এ জিনিসকে সাধ্যমত ছাড়ান উচিত। তা সম্ভব হতে পারে যদি ঘুমোবার ঠিক আগে কিছু সময় তুমি একাগ্র হয়ে থাকতে চেষ্টা কর, আপন আস্পৃহার প্রতি একাগ্র হওয়ার দ্বারা কিংবা ভগবৎ প্রার্থনার দ্বারা আপন সর্বোত্তম অংশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাক। এটি ঠিক ভাবে সম্পন্ন হলে তার পর ঘুমোতে যাও। এই একাগ্রতার অবস্থাটা যদি সেইটুকু সময়ের জন্য এনে ফেলতে সক্ষম হও, তাহলে ঘুমের মধ্যে তুমি এমন স্বপ্ন দেখবে আর তাতে এমন ধরনের অনুভূতি

মিলবে যা জেগে উঠেও তোমার মনে থাকবে, আর সেই সঙ্গে নিজের দুরূহ সমস্যাগুলির এমন সব সমাধান মিলে যাবে কিংবা তার সম্বন্ধে কোন এমন সঙ্কেত মিলে যাবে, যা জাগ্রত অবস্থাতে পাওয়া সম্ভব হয়নি ; হয়তো জীবনে এমন কোন ব্যাপার ঘটেছে যেখানে তোমাকে হেস্তনেস্ত একটা কিছু স্থির করে ফেলতে হবে অথচ কি করা উচিত তা কোনমতেই ভেবে পাচ্ছ না ; হয়তো চেতনার অন্তরালে এমন কিছু রয়েছে যা জাগ্রতকালে কোনমতেই সুস্পষ্ট হচ্ছে না, অথচ তাতে তোমাকে ক্লিষ্ট করছে তা বুঝতে পারছ, স্বাভাবিক উপায়ে যে তার কিনারা ক'রে ফেলতে পারবে সে অভ্যাস তোমার নেই। ঐরূপ অবস্থাতে তখন প্রতীকবিকাশী স্বপ্নের দ্বারা এই সব জটিল প্রশ্ন তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। জাগ্রতে যা অন্ধকার ও দুর্বোধ্য ছিল সেগুলি সরল ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সারাদিন যা নিয়ে ব্যাপৃত থাক বা যে কাজগুলি করতে থাক তার সঙ্গে এইজাতীয় স্বপ্নের কোন সম্পর্কই থাকে না, ঘুমোতে যাবার আগে চেতনার যেমন অবস্থা থাকে তারই উপর সেগুলি নির্ভর করে। তার জন্য ঘুমোবার আগে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্য ঐকান্তিক আস্পৃহা নিয়ে থাকা, তাতেই যথেষ্ট, ঘুমের মধ্যে সব কিছু ঘুলিয়ে ওঠার বদলে ওতে তুমি ঘুমেরই ভিতর দিয়ে অনেক জোরালো রকমের সাহায্য পেয়ে যাবে।

আবার, ঘুমোতে যাবারও যেমন ব্যবস্থা আছে, ঘুম থেকে ওঠারও তেমনি ব্যবস্থা আছে। ঘুম ভাঙামাত্রই ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে না উঠে, কিংবা হাত-পা ছুড়ে

আড়ামোড়া ভাঙতে না থেকে কিছুক্ষণের জন্য স্থির ও শান্ত হয়ে অবস্থান করবে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা না করে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ জেগে উঠবে ; তাহলে ঘুমের মধ্যে যা ঘটেছিল, অদ্ভুত বা আশ্চর্য ব্যাপার যা দেখেছিলে, তারই একটা অস্পষ্ট আভাস তখন মিলবে। স্থির থেকে মনোযোগের সঙ্গে তা স্মরণ করবে। এতে রাত্রের ঘুমের সময়কার ক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে আধাআধি ভাবে মনে পড়ে যাবে। আরো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সেই দিকে মন রাখ, তাহলে হয়তো স্বপ্নের শেষের প্রান্তটি স্মরণ হয়ে যাবে, তখন সেটিকে ধরে পিছনের দিকে চলে যাও—অবশ্য তখনও তেমনি স্থির থেকে—তাতে সমস্ত স্বপ্নটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ঘুমের মধ্যে কি কি কাণ্ড হয়ে গেছে সবই তখন জানতে পারবে।

ঘুমের মধ্যে তোমরা অনেক কিছুই কর, জেগে উঠে তা ভুলে যাও। কিন্তু জাগা অবস্থাতে স্মরণ থাকলে সেগুলিকে ইচ্ছামত সুনিয়ন্ত্রিতও করতে পার। যা চেতনার নাগালের মধ্যে আসে না তার উপর নিজের কোন হাত থাকে না। কোন বিষয়ে চেতন হলে তবেই তার উপর শাসন দমনের ক্ষমতা আসে। ঘুমের ভিতরকার ঐ সব ক্রিয়ার উপর দখল থাকলে ঘুমের সময় পূর্ণ বিশ্রাম মিলতে পারে। অনেক সময় এমনও হয় যে ঘুমোবার আগে যেমন ছিলে, ঘুমের পরে তার চেয়েও বেশি ক্লান্তি বোধ করতে থাকলে। তার মানে ঘুমের মধ্যেও ব্যস্ত হয়ে থাকা তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যেমন প্রাণসত্তাকে ছুটিয়ে বেড়ান, মনকে এলোমেলো ঘোরান, ইত্যাদি। তাই জেগে উঠে দেখ যে ঘুমিয়েও বিশ্রাম

হয়নি। কখনো-বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অন্ধকার নোংবা পরিস্থিতির মধ্যে ঢুকে পড়লে আর সেখানে ছটফট করতে থাকলে, স্বপ্নের মধ্যে হয়তো অনবরত আঘাত দিচ্ছ, আঘাত পাচ্ছ, লড়াইতে হেরে গিয়ে ভূমিসাৎ হচ্ছ। চেতনার সাহায্যে দখল এসে গেলে এগুলিকে এড়ান যায়।

*   *   *   *

নিজেকে যখন কেউ মৃতবৎ দেখতে পায় তখন তার অনেক অর্থই হতে পারে। তা আধ্যাত্মিক মৃত্যুও হতে পাবে, প্রাণাংশেব মৃত্যুও হতে পাবে, অর্থাৎ নিজের যে অংশটিকে বাদ দিতে চাইছ তারই মৃত্যু হতে পারে; এমন যদি হয় তো বুঝতে হবে যে চেতনাব উন্নতিই হচ্ছে। আবাব অপর পক্ষে ওটি প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বাভাসও হতে পারে। কোথায় কেমন অবস্থাতে এরূপ দেখা যাচ্ছে সেই বুঝে এর অর্থ করতে হবে।

মনের ভিতর বাজার বসা

মগজের মধ্যে কি যে হট্টগোলের বাজার বসে সে তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। সেখানে কেমন ব্যাপার চলেছে তা যদি চোখে দেখতে পাও তো স্তম্ভিত হয়ে যাবে। দেখলেই বুঝবে যে সেখানে কিছু সুব্যবস্থার দরকার, এলোমেলো জটলাকে জট ছাড়িয়ে গুছিয়ে ফেলা দরকার; লক্ষ্য করলেই দেখবে যে কোন দুটি বিরুদ্ধ ভাব পরস্পরের পার্থক্য বজায় রেখে সমান্তরাল ভাবে কখনই চলে না।

এমন অনেকের কথাই জানি, তাদের মাথার মধ্যে অনেক বিপরীত মনোভাব জড় হয়ে একসঙ্গে রয়েছে— অবশ্য তার সুসঙ্গত সমন্বয় নেই, সমন্বয়ের কোন প্রশ্নই এখানে আসে না— আর সেগুলি এক বাড়ির দুই ভাই-এর মত চিরদিন ঝগড়া বিবাদই করতে থাকে, কারণ যতক্ষণ তুমি উচ্চতর বা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দুটিকে আপোষে মিলিয়ে না দিচ্ছ ততক্ষণ বিপরীত ভাবগুলি কিছুতে নির্বিরোধে থাকতে পারে না; কিন্তু সে হবে অন্য উঁচু দরের কাজ। ঐ সকল লোকে প্রায়ই এ কথা বুঝতে পারে না যে তারা দুই রকমের বিপরীত ভাব নিয়ে নিজেরাই নিজেদের মতকে খণ্ডন করে যখন তখন উল্‌টো উল্‌টো কথা বলছে, এতে তাদের কিছুমাত্র বাধে না। এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য রয়েছে—আমি যদি সেগুলি বলে যাই তাহলে এক মুখে দুই-রকমের কত অসম্ভব অসঙ্গতির কথা শুনে তোমরা হাসি চাপতে পারবে না।

তোমাদের নিজেদেরই এক কাজ করতে বলছি শোন।

সকল রকমের প্রশ্ন সম্বন্ধেই তোমাদের নিজেদের কিছু কিছু ধারণা নিশ্চয় আছে। জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, অস্তিত্বের কারণ ও তার গোড়ার কথা সম্বন্ধে, কোথা থেকে আমরা এখানে এলাম, কি কাজের জন্য এসেছি, এর পরিণামে কি হবে, ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু না কিছু ধারণা রয়েছে। এখন সেগুলিকে একবার সামনে হাজির করে সাজিয়ে দেখ। এ কাজ খুব কি সহজ মনে হচ্ছে? চেষ্টা করতে গেলেই দেখবে যে তাতে কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার হতে থাকবে। প্রথমতঃ, কোন এক নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্বন্ধে যা কিছু ধারণা আছে সেগুলিকে যদি সামনে হাজির করে পরে পরে সাজিয়ে রাখ, যেমন ক্লাসে প্রবন্ধ লিখতে বসে তোমার বক্তব্যগুলিকে সাজিয়ে নাও, তাহলে তাতেই অনেক হাস্যকর ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমার এমন অভ্যাস থাকে যে একটি কেন্দ্রস্থ অটল সত্যকে বরাবর বজায় রেখে পরে যা কিছুই ধারণা জন্মাক সেগুলিকে ওরই চারিপাশে তুমি ওরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠতে দিয়ে থাক, তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা; আর তেমন অভ্যাস যদি না থাকে, তাহলে উপরোক্তভাবে চেষ্টা করতে গেলেই দেখবে যে তাতে বিপদে না পড়লেও অন্ততঃ ফাঁপরে পড়ে গেছ। বস্তুতঃ একটি ঘণ্টার মধ্যেই কত যে উল্‌টো উল্‌টো রকমের কথা তুমি অবলীলাক্রমে ভেবে যাচ্ছ, সে সম্বন্ধে তোমার নিজের কোন ধারণাই নেই। একটা কোন প্রশ্ন নিয়েই ভেবে দেখ, যেমন "জীবনটা চলছে কোন্ লক্ষ্যের দিকে?" কিংবা "মানুষ যদি মরবেই তবে জন্মায় কেন?"—এমনি কিছু সাধারণ অথচ জটিল প্রশ্ন হওয়া চাই—আজ

ফুটবলের বদলে বাস্‌কেট বল খেলা কেন, এ ধরনের প্রশ্ন নয়, কারণ ওর উত্তর সহজেই মেলে,—এবং তার পরে সে সম্বন্ধে তোমার মনে যখন যা ধারণা হচ্ছে সেগুলিকে সামনে রেখে সাজিয়ে ফেল ; এতেই দেখবে যে মোটের উপর তা কি অদ্ভুত হয়ে দাঁড়াল।

কোন ধারণাটি নিজের আর কোনটি অপরের কাছে ধার করা (বই থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে) তা কেমন করে জানা যাবে ?

নিজের ধারণা আর পরের ধারণা বলে কোন কথাই নেই। ওর কোনটাই নিজের হতে পারে না। ধারণার বিশ্বময় ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেকেই আপন প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুযায়ী তা টেনে নেয়। ভাব ও ধারণা হল বারোয়ারি জিনিস, সাধারণের যৌথ সম্পত্তি। তবে তার মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। এক হল অতি সরল সার্বজনীন স্তর, ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেরই মাথায় সে ধারণা কাজ করবে, তার সীমানার মধ্যে সবাই ডুবে রয়েছে। সে হল সকল জনের স্তর। তার পরের স্তরটি ওর থেকে কিছু উঁচুতে, যাদের আমরা চিন্তাশীল বলি সে হল তাদের স্তর। ওর চেয়ে উঁচুতে আরো অনেক স্তর রয়েছে, তার মধ্যে কোনটি বাক্যের অতীত হয়ে গেছে, কোনটি বাক্যের সীমা পার হলেও তখনও ধারণার সীমা পার হয়নি। যারা ওর চেয়েও উঁচুতে উঠতে পারে তারা এমন কিছুর নাগাল পায় যা শুধুই একটা আলোর মত, তারা তাকে তার ভাবটি সমেত নীচে নামিয়ে আনে। খুব উঁচু থেকে যে ভাবটিকে নামিয়ে আনা হয় তা নীচে এসে নিজের

স্থান করে নিয়ে চিন্তারূপে দানা বাঁধে আর বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করে। তখন, তুমি যদি লেখক কিংবা শিল্পী হও আর সেটিকে আরো বাস্তবের রূপ দিতে চাও, তাহলে অনেক উঁচু থেকে টেনে আনা অতি ক্ষুদ্রতম একটি ভাবকেও নানা বাক্য দিয়ে এবং আকার দিয়ে অসংখ্য রকম সাজিয়ে দেখাতে পার। আর তা যদি পার, তখন জানবে যে একটি বিশুদ্ধ ভাব ও তাকে অভিব্যক্ত করার চেষ্টার মধ্যে কতখানি পার্থক্য। সে কাজ যদি নিজের দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে তুমি সে বিষয়ে পরের সাহায্য নিতে পার, বই থেকে বা কারো কাছ থেকে সে বিষয়ে জেনে নিতে পার। যেমন মনে কর, একটি বিশেষ ভাবকে নিয়ে কত কবি কত বিভিন্ন রকমে ফুটিয়েছেন, তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে। ওর মধ্যে আবার মৌলিক ভাবও আছে, তার আবার পর্যায় বা শ্রেণী-বিভাগ আছে, তাকে রূপ দেবার নানা বৈচিত্র্য আছে। এই সকল জিনিস নিয়ে নিজের মনকে শিক্ষানবিশী করাতে পার, তার দ্বারা মনকে নমনীয় ও সুপটু করে যথেষ্ট মানসিক দক্ষতা অর্জন করতে পার।

বাস্তবিক যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি হতে চাও, তাহলে এইভাবে মনের কসরৎ শিখতে হবে, যেমন বলশালী হতে হলে দেহের কসরৎ করতে হয়। যারা মনের কসরৎ করে না তাদের মস্তিষ্ক চিরকাল গোড়ার অবস্থাতেই থেকে যায় : সারাজীবন তারা শিশুর মত কাঁচা মনোভাব নিয়েই থাকে। মনের উৎকর্ষ কেমন ভাবে করতে হয় তা শিখতে হবে আর যত্নের সঙ্গে তার অনুশীলন করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ, মনের মধ্যে সাব্যস্ত করা কোন

মতামতকে গোঁ ধরে আঁকড়ে থাকবে না, যেমন,—এই কথা নিশ্চয়ই ঠিক আর ওটা ভুল, এই যুক্তিটাই ঠিক আর ওটা বেঠিক, এই ধর্মটাই সত্য আর অন্য সব ধর্ম মিথ্যা, ইত্যাদি। এমন মনোভাবকে যদি আঁকড়ে থাক, তাহলে তুমি চিরদিন নির্বোধ হয়েই থেকে যাবে। ধর্মের দিকটাই যদি ধর, তাহলে সকল ধর্মকে নিয়েই ধীরভাবে বিচার করলে দেখতে পাবে যে একই পরম অজানাকে কোনপ্রকারে জানবার জন্য সকল ধর্মই মানুষের আস্পৃহাকে কত নানাভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। ধর্মগুলিকে ভাল করে জেনে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা ও সমালোচনা করে দেখ, কার কতখানি ওজন তা যাচাই করে দেখ, বিচার-বিবেচনা করে হৃদয়ঙ্গম করে দেখ, তাহলে এ কাজ তখন খুবই কৌতূহলপ্রদ হবে। তেমনি নানা ভাবকে এবং তার অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধারাকে যদি নিরপেক্ষভাবে বুঝে নিতে পার, তাহলে সেগুলির উপরে উঠে গিয়ে তুমি দেখতে পাবে যে মানুষ ওর বড়-ছোট এবং ভাল-মন্দ নিয়ে চিরকাল ধরে কত হাস্যকর ভাবে লড়াই করে এসেছে। তখন তোমার নিজের মনের উপর একটা দখল আসবে; সাধারণ মানুষ সচরাচর যা করে থাকে তুমিও তাই করতে যাবে না--অর্থাৎ তোমার মতের সঙ্গে অন্য কারো মতের মিল না হলেই যে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠা, তেমনটি আর হবে না।

বৃক্ষাশ্রয়ী প্রেতাত্মা

সেদিন বলেছিলেন, অনেক প্রেতাত্মা গাছে আটক হয়ে থাকে। কিসে তারা ছাড়া পায় ?

কেন, ছাড়া পাবার কথা কেন ?

আপনি বলেছিলেন, কেউ যদি তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে প্রার্থনা জানায় তবেই তারা ছাড়া পায়।

হাঁ, কিন্তু সেটা গল্পকথা। খ্রীষ্টধর্মের কিংবদন্তীতে ঐভাবে কথাটা বলা হয়েছিল, লোককে শিক্ষা দেবার জন্য। তেমনি আরো বলা হয়েছে যে তুমি যদি বদ লোক হও তাহলে মৃত্যুর পরে তোমাকে তার জন্য নরকে শাস্তি পেতে হবে, যদি তেমন শাস্তিভোগ থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এখানে পুণ্যের জীবন যাপন কর। বাস্তবিক কিন্তু পাপ কাজ ও তার শাস্তির কোন প্রশ্নই নেই; আর শাস্তির জন্য প্রেতাত্মাদের গাছে আটক রাখা হয় এ-কথাও ঠিক নয়। মানুষ যখন মরে, তখন তার প্রাণসত্তা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু নতুন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে হয়তো দেখে যে সেই অচেনা জায়গা তার পক্ষে অনুকূল নয়, বিশেষতঃ যখন দেখে যে পৃথিবীর চেনা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়জনদের মধ্যে এমন কেউই সেখানে নেই যারা তাকে কিছু সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে বা স্নেহ করে নতুন জায়গাতে তার সঙ্গী হবে। এমন প্রতিকূল অবস্থায় যারা গিয়ে পড়ে তারাই সুবিধা পেলে কোন গাছের উপর আশ্রয় নিয়ে থাকে। গাছটিও তেমনি হয় আশ্রয় দেবার মত প্রকাণ্ড এবং প্রাচীন, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ তার ডালপালা, প্রাণশক্তি তার

মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। সেই গাছের ভিতরকার তন্তুর ভিতর দিয়ে যে স্নিগ্ধ রসধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার যথেষ্ট জীবনীশক্তি, তাই মৃতব্যক্তির অনাশ্রিত প্রাণসত্তা অমন গাছের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেখানে জোর করে আটক রাখার কোন কথাই নেই, সুতরাং ছাড়া পাবার প্রশ্নও আসে না।

ঐ সব প্রেতাত্মারা কি মানুষের পক্ষে অনিষ্টকারী হয় ?

কেনই-বা তা হবে ? সাধারণতঃ তা হবার কথা নয়।

তবে যে শুনি এরা মানুষের উপর ভর করে তাদের উপর অনেক উৎপীড়ন করে ?

সে হল অন্য রকমের জিনিস। যারা এমন কাজ করে তারা ঐরূপ আত্মা নয়, তারা হল প্রাণরাজ্যের অন্তর্গত নানারকম বিরোধী শক্তি। কিন্তু এখানে আমরা বলছিলাম মৃত্যুর পরে মানুষের দেহমুক্ত প্রাণসত্তাটির কথা। আর যেখানে সেইসব বিরোধী শক্তিরাই ভর করে, সেখানেও যা বাস্তবিক ঘটে তা অন্য ব্যাপার। সাধারণতঃ ঐসব ভরের জিনিস, যাকে ভূত বলা হয়, তা মানুষেরই দ্বারা গড়া। ভয় থেকেই তা জন্মায়; মানুষের মন থেকে জন্মান জিনিসটা বাস্তবের আকার নেয়। ভয়ের মাত্রা যত বেশি, সে জিনিসও তত বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এমনি কত শত ঘটনা আমার গোচরে এসেছে, তাতে দেখেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কল্পনার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। কিছুদিন আগে শুনলাম, একটা গাছে ভূত আছে। গয়লারা বললে তারা স্বচক্ষে দেখেছে! আমি অমৃতকে পাঠিয়ে বলে দিলাম, ধূপধুনা জ্বেলে সেই গাছটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে এসে সবাইকে বলতে যে ভূত এবার পালিয়ে গেছে।

তার পর থেকে ভূত আর দেখা গেল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাই হয়, ভয় থেকে ভূত জন্মায়।

মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা কত কাল গাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে?

তা অনেক কিছুর উপরেই নির্ভর করে। কেউ-বা অল্পকালের জন্যই থাকে; আবার যাদের প্রাণসত্তা খুব দৃঢ়ভাবে গড়া তারা হাজার বছর ধরেও আশ্রয় নিয়ে টিকে থাকে, যদি অবশ্য গাছটিও হাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকে।

এই সব প্রেতাত্মা কি নিম্নজন্তুদের দেহ ছেড়েই গাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়?

তা ঠিক নয়। যে প্রাণসত্তা মৃত্যুর পরেও টিকে থাকবে, তার ততটা পর্যন্ত পরিণতি থাকা দরকার, অর্থাৎ তেমনি স্থায়ী রকমের গঠন আসা দরকার। কিন্তু জন্তুদের প্রাণসত্তা নিতান্ত তরল, তার তেমন গঠন নেই, সুতরাং দেহের আশ্রয় ছেড়ে সে ঐভাবে টিকতেই পারে না। জন্তুদের প্রাণসত্তা মৃত্যুর পরে তখনই ভেঙে গিয়ে প্রকৃতির শক্তিগুলির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কেবল মনওয়ালা মানুষদের বেলাতেই প্রাণসত্তা কোন ব্যক্তিত্বের আকার নেয়, আর সেই ব্যক্তিসত্তার পক্ষেই মৃত্যুর পরেও টিকে থাকা সম্ভব হয়।

কুকুর কি মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত নয়?

হাঁ, তা বলতে পার, কারণ বিশ্বস্ত আর প্রভুভক্ত হওয়াই ওদের স্বভাব, আর মানুষের মত মনের জটিলতা ওদের মধ্যে নেই। এই মনের জটিলতা থাকে বলেই মানুষ ওদের মত বিশ্বাসী কিংবা বিশ্বাসভাজন হতে পারে না। আর অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসী হয় না এই ভয়ে যে পাছে বিশ্বাস করে সেখানে ঘা খেতে হয়, পাছে ঠকে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাছাড়া যেটুকু বিশ্বাস বা আস্থা তাদের মধ্যে থাকে তারও অন্তরালে অনেকটা আমিত্বের ভাব লুকিয়ে থাকে, কতকটা সচেতন লেনদেনের শর্তের মত, "আমি যেমন তোমাকে বিশ্বাস করছি, তোমার কাছ থেকেও তেমনি দাম পাওয়া চাই, অর্থাৎ আমার উপর যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করবে, কেবল নিজের কাজটি গুছিয়ে বসে থাকবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" কুকুরদের বেলা এসব প্রশ্নই নেই, কারণ তাদের মনই হল অল্প একটুখানি। অমন স্বার্থপর আচরণ করবার মত ধারালো প্যাঁচালো বুদ্ধিই তাদের নেই। কিন্তু তাই বলে মানুষ হয়ে আমরা ঐ কুকুরদের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না। বরঞ্চ আমাদের এর চেয়ে আরো বেশি উপরে উঠতে হবে, মানব থেকে অতিমানবে গিয়ে পৌঁছতে হবে, ঐ কুকুরের ভাল গুণটি আরো উঁচুতে উঠে ভালভাবে অর্জন করতে হবে। তার মানে ওদের মত অন্ধভাবে, অর্ধচেতন ভাবে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে বিশ্বাসী হওয়ার বদলে আমাদের হওয়া চাই সজ্ঞান সচেতন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিশ্বাস ও আস্থা, আর বিশেষ করে তা হবে আমিত্বশূন্য। এমন একটি

উদ্দিষ্ট আছে যেখানে পৌঁছে গেলে সকল বিশ্বাসই মিলিত হয় ; সেটি হল এই আমিত্বের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে। বিশ্বাসই বল আর ভক্তিই বল আর প্রেমই বল আর দাস্যভাবই বল—এগুলি যখন আমিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে তার উপরের স্তরে গিয়ে উঠেছে তখন ওর সবগুলিই সমান, বিশেষতঃ তা সমান এই দিক দিয়ে যে সবই চায় নিজেকে উজাড় করে দিতে, তার বদলে আদায় করে নিতে কিছুই নয়। তুমি যদি একটি ধাপ উপরে উঠে দাঁড়াও, তাহলেই দেখতে পাবে যে এই সব যে কোন পন্থাই ধরা হয় তা করণীয় কর্তব্য হিসাবে বা ত্যাগ হিসাবেও নয়, সবই এসে পড়ে এক তীব্র আনন্দের প্রেরণায় এবং সেই আনন্দেই তার দাম মিলে যায়, প্রতিদানের কোন প্রশ্ন যে সেখানে আসছে না তাতেই মহা আনন্দ। কিন্তু ঐ ধরনের ভাব আনতে গেলে তোমাকে অনেকখানি উঁচুতে এমন জায়গায় উঠতে হবে যেখান থেকে আর নিজের দিকে ফিরে চাওয়া নেই, আর সেই সব তৎপরতাও সেখানে আসে না যা নীচের দিকে তোমাকে টানবে—যেমন নিজের প্রতি নিজের দরদ, নিজের দুঃখে বিগলিত হয়ে বলা "বেচারা আমি"। এটি অত্যন্তই হানিকর মনোভাব, এতে তখনই তোমাকে অন্ধকার খাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

যদি তুমি পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আত্মদানের সেই আনন্দ পেতে চাও, যাতে সে দান কেউ নিল কিংবা না নিল তা চেয়েই দেখবে না, তার জবাব কিছু আসছে বা না আসছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না, তাহলে ঐ ধরনের হানিকর মনোভাবকে একেবারে ছাড়িয়ে চলে যেতে হবে। যাই কিছু কর তার

বদলে আদৌ কোন কিছু প্রত্যাশা করবে না, চাইবেও না কোন কিছু পেতে, তপস্যার ভিতর দিয়েও নয় বা ত্যাগের ভিতর দিয়েও নয়, যে আনন্দের চেতনা তুমি আপনা থেকে পাবে সেইটুকুই যথেষ্ট : বাইরের থেকে যদিও কিছু ফলাফল মিলে যায় তবু এই আনন্দের দামই তার চেয়ে অনেক বেশি।

আশ্রমের কাজ

পার্থিব সাফল্যের দিক দিয়ে এখনকার চেয়ে আরো ভাল রকমের কাজ এখানে নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। কিন্তু আমি বলতে চাই আসল কর্মপ্রেরণার কথা, ওর গভীরতম অর্থে। সে অর্থে কাজ করা মানে দেহ দিয়ে প্রার্থনা করা। কাজের মধ্যে ঐ ভাবটি আনার চেষ্টা থাকলে তাতে ভগবান প্রসন্ন হন, যে মহাচেতনার নজরে কোন কিছুই এড়ায় না, তিনি ওতে পরিতুষ্ট হন। কৃতিত্বের দিক থেকে দেখলে সে কাজটি যে এর চেয়ে আরো ভাল ভাবে করা যেত না এমন কথা নয়। আমাদের পক্ষে কিন্তু সাধনমার্গের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে কর্মতৎপরতা হল একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। ওটি ছাড়াও আমাদের আরো অনেক কিছু করবার আছে। কোন বিশেষ একটি কাজকে রীতিমত নিখুঁত করে তুলতে হলে তার জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার, প্রচুর সংস্থান ও সঙ্গতির দরকার, তেমন সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু আমরা কেবল ঐ একটা দিক ধরেই নিখুঁত হতে চাইছি না, আমরা চাইছি সব দিক দিয়েই এক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি।

বাইরের দিক থেকে দেখলে আমাদের কাজে হয়তো অনেক কিছু দোষত্রুটি বেরিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে দেখলে যা করা হচ্ছে তা ভালই করা হচ্ছে। বাইরের জগৎ থেকে তোমারা মনোগত ও বুদ্ধিগত নানারকম ধারণা নিয়ে যখন এখানে আস, তখন হয়তো দেখবে যে এখানে 'এমন কিছুই করা হয়নি যা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তেমন

বিচার করতে গেলে এর অন্তরালে যে জিনিস রয়েছে সেটি তোমার নজর এড়িয়ে যাবে: সে জিনিস হল সাধনা। আরো গভীরতর চেতনা দিয়ে যদি দেখ তাহলে দেখবে যে অভিষ্টসিদ্ধির দিকের প্রচেষ্টা সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। বাইরের চোখ দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকটা দেখা যায় না; সে চোখ আপন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়েই সব কিছুর বিচার করে।

অনেকে যখন আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে এসে যোগ দেবার জন্য আবেদন পাঠায়, তখন তারা প্রায়ই জানতে চায় যে এখানে কি কি ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি দেওয়া হয়, এখানে যে সব শিক্ষা দেওয়া হয় তা পরে কোন্ বৃত্তি অবলম্বনেব পক্ষে সহায়ক হতে পারে। তাদের তখন আমি এই জবাব দিয়ে থাকি: যদি তোমাদের ঐ সকল জিনিসের প্রয়োজন থাকে, তাহলে বাপু এখানে নয়, অন্যত্র চেষ্টা দেখ। ওর জন্য আরো অনেক জায়গা আছে, এমনকি এই ভারতেই আছে, ঐ বিষয়ে সে সব স্থান এখানকার চেয়ে অনেক ভাল। আমাদের তেমন সরঞ্জামপত্রও নেই, তেমন গৌরব করার মত জাঁক-জমকও নেই। সেই সকল স্থানে গেলে তোমরা ঐ ধরনের অভিষ্টলাভ করতে পারবে। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতাই নেই। আমাদের কাজ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র স্তরে।

কিন্তু তাই বলে আমি বলছি না যে তোমরা মনে মনে অন্যদের চেয়ে নিজেদেরকে বড় মনে করতে শেখ। প্রকৃত চেতনা যার হয়েছে সে কখনই নিজেকে বড় মনে করে না। কেবল ক্ষুদ্রচেতারাই নিজেকে বড় বলে জাহির করে। তেমন

লোকের চেয়ে: একটি শিশুকেও বেশি উন্নত বলতে হয় ; কারণ সে যা কিছু করে তা আপন সরল স্বভাব থেকে। সে ধরনের ক্ষুদ্রতা থেকে তোমরা উপরে উঠে যাও। কেবল ভগবানের সঙ্গে কোথায় তোমাদের সম্পর্ক, আর তোমরা তাঁর জন্য কোন্ কাজে লাগতে পার, এ ছাড়া আর কোন বিষয়েই তোমাদের ঔৎসুক্য থাকার দরকার নেই। প্রকৃত ঔৎসুক্যের বিষয় কেবল এটাই।

চিন্তাই স্রষ্টা

মনের চিন্তার দ্বারা মনোময় জগতে বাস্তব জিনিসের সৃষ্টি করা যায়। চিন্তাশক্তিও এক রকমের সৃষ্টিশক্তি। চিন্তার দ্বারা নিত্যই তুমি কোন কিছুকে একটা বাস্তব আকার দিচ্ছ এবং তোমার সেই সৃষ্টিগুলিকে চারিপাশের আবহাওয়ার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছ, সেগুলি তোমার মন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছু কাজও করছে। তেমনি নিজেও তুমি নানারূপ চিন্তায় গড়া জিনিসের ভিড়ের মধ্যে সর্বক্ষণ বেষ্টিত হয়ে রয়েছ। অবশ্য তেমন সুস্পষ্ট আকার দেবার মত করে অনেকে চিন্তাই করতে পারে না; তারা কেবল কতকগুলি আবর্তনের সৃষ্টি করে। কিন্তু যারা সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম তাদের বেলা তাই থেকে নানাবিধ চিন্তারূপ গড়ে ওঠে, সেগুলি বাইরে বেরিয়ে তাদের কাজ সেরে ফিরে আসে, আর তখন পুনশ্চিন্তা হয়ে মনের মধ্যে আবার দেখা দেয়। এমন অনেক স্থলে দেখা যায় যে চিন্তক ব্যক্তিরা তাদের আপন চিন্তারূপের ভারে নিজেরাই উত্যক্ত হয়ে ওঠে, সেগুলি যেন ভর করে থাকার মত নিত্যই তাদের পেয়ে বসে, কিছুতে ছাড়ান যায় না; যাকে নিজেরাই গড়ছে তাকে ভাঙবে কেমন করে, সে উপায় খুঁজে পায় না। একটি সুদৃঢ় চিন্তারূপকে যখন তুমি আকার দেবে তখন সে তোমাকে সর্বক্ষণই জড়িয়ে থাকবে; পুনঃপুনঃ দেখা দিয়ে তোমার মাথার মধ্যে ডাঙশ মারতে থাকবে, আর উত্তরোত্তর তার শক্তি বেড়ে যেতে থাকবে। শেষে তোমার পক্ষে তাকে এড়ান দায় হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে অনেক রকম

সমস্যার কথা জানবার আছে। কিন্তু মানুষ আছে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে; তাদের নিজেদের মধ্যে যে কত রকমের শক্তি লুকিয়ে আছে সে খবর তারা নিজেরাই কিছু জানে না, আর যতটুকু-বা জানে তাও অতি সামান্য।

খাঁটি আদিমপন্থী বৌদ্ধেরা ভগবানে বিশ্বাস করে না, শাশ্বত কোন সদ্‌বস্তুতেও না। দেবদেবীও তাবা মানে না, অর্থাৎ দিব্যসত্তার কোন অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু মনের শক্তিকে তারা স্বীকার করে, তাকে তারা অতি সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে জানে। বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি মানুষকে তার আপন মনোযন্ত্রটির ব্যবহারে যথেষ্ট সুনিপুণ করে তোলে। একবার এই ধরনের এক বৌদ্ধ সাধক আমাকে এসে বলল যে সে এক নতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করছে: চিন্তার দ্বারা সে এক মহাত্মারূপী সত্তার সৃষ্টি করেছে। এ বিদ্যা সে জানত এবং পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করে দেখেছে যে এই সব মনোময় সৃষ্টি কিছুকাল পরে আপনা থেকে একটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আর তখন সে নিজের স্রষ্টার নাগালকে ছাড়িয়ে যায়, —যদিও তারই সঙ্গে সংলগ্ন তবু তার বশে আর থাকে না, সে তখন নিজেরই স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করতে থাকে। তেমনি জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে সে বেচারা এখন এক মহা মুশকিলে পড়েছে। সে বললে, "আমার এই মহাত্মাটিকে এমনই বাস্তব করে তুলেছি যে, এখন সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাকে নিত্যই যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে আমার এটা ওটা কাজের দোষ দেখিয়ে আমাকেই রীতিমত ধমকাতে শুরু করে, সব বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিতে আসে, আমার জীবনের

ব্যাপারকেও তারই হুকুমে চালাতে চায়। কিছুতে তাকে ছাড়াতে পারছি না। এই মহাত্মা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, একবারও আমাকে রেহাই দেয় না। প্রত্যেক কাজেই আমাকে বাধা দিচ্ছে, অথচ নিজেরই সৃষ্টি জেনেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না।" বস্তুতঃ তার প্রভাব এড়াতে অনেক চেষ্টা করেও সে বিফল হয়েছে। আমি তখন তাকে বললাম, "তুমি গড়তে জান, কিন্তু ভাঙতে জান না।" কৌশলটা যেমনি তাকে শিখিয়ে দিলাম, অমনি পরের দিন হাসিমুখে এসে বললে, "সেটা ছেড়ে গেছে।" অর্থাৎ যোগসূত্রটি সে কাটতে পারছিল না; আর কেবল কাটলেও হয় না, কারণ কাটলেও সে আলাদা সত্তারূপে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। যাকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে তাকে আবার গিলে ফেলতে হবে, যাকে উদ্গীরণ করা হয়েছিল তাকে আবার নিজেই গলাধঃকরণ করে নিতে হবে।

চিন্তা ও কল্পনা

যখনই তুমি কোন মানুষ বা কোন জিনিসকে নিয়ে গভীর চিন্তা করবে তখনই একরূপ ভাবে তার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তার স্পর্শলাভও করতে পাববে। কিন্তু এটি হয় কেবল চিন্তার রাজ্যে; প্রাণ বা স্থূলদেহের সম্বন্ধে কোন খবরই তোমার মিলবে না। মনের জগতে চিন্তা কেবল চিন্তারই খবর জানতে পাবে; তোমার চিন্তার সাহায্যে তুমি অনেক দূরের কারো মনেব দিকের খবরটাই পেতে পাব, তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাব চিন্তার সম্পর্কেই কিছু জানতে পার, কিন্তু তাছাড়া আর কোন বিষয়ে নয়, তার প্রাণ বা স্থূলদেহের সম্পর্কে কোন কিছুই না।

যদি তার প্রাণের খবর জানতে চাও তাহলে তোমার প্রাণসত্তাকেই সেখানে যেতে হবে; তার মানে নিজের দেহের অন্ততঃ তিন ভাগকে সমাধিস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে তোমার প্রাণসত্তাকে ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে চলে যেতে হবে। আর তুমি যদি তাকে বাস্তব স্থূলদেহেই দেখতে চাও, তাহলে তোমার সূক্ষ্মদেহকে সেখানে গিয়ে হাজির হতে হবে; নিজের স্থূলদেহটি তখন সম্পূর্ণই মূর্ছিত অবস্থাতে পড়ে থাকবে। এ বিদ্যা যে জানে তার পক্ষে আপন দেহটিকে আগলাবার কোন লোক পাশে না রেখে এগুলি করা যায় না।

কিন্তু কেবল মনকে বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া সব সময়েই চলতে পারে। ওটি করতে পারলে তুমি মনোজগতের সংস্পর্শে আসতে পার। তোমার চেতনা যদি খুব ধারাল

হয়, আর যার সম্বন্ধে তুমি চিন্তা করবে তারও যদি তাই হয়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট সময়টিতে সে কোন্ ভাব নিয়ে কোন্ কথা ভাবছে তা তুমি জানতে পারবে, কিন্তু সেও হবে কতকটা পরোক্ষ ভাবে, সরাসরি নয়।

আর কল্পনার কথা আলাদা। যখন তুমি কোন কিছু কল্পনা করছ, তার মানে সেটিকে তুমি নিজের মনের মধ্যে গড়ে নিচ্ছ, তোমার মনের রূপগঠনের ক্ষমতা অনুসারে সে জিনিস সত্যের কাছাকাছিও যেতে পাবে, আবার সত্যের থেকে অনেকখানি তফাৎও হতে পারে। এমন মানুষ আছে যাদের কল্পনাশক্তি এতই প্রবল যে তারা যাই কল্পনা করে তাই বাস্তবে পরিণত হয়। অর্থাৎ কল্পনার গঠনটি তাদের এতই শক্তিধর যে শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপ নেয়। তাদের যথার্থই স্রষ্টা বলা যায়। এমন মানুষ অবশ্য বেশি নেই, কিন্তু অল্পসংখ্যক কেউ কেউ তেমন আছে নিশ্চয়ই।

মরার পরে যারা মনোময় রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে, তাদের সঙ্গে চিন্তার মাধ্যমে তোমার সাক্ষাৎ ঘটতে পারে; তখন তাদের মনের সঙ্গে তোমার মনের সংস্পর্শ ঘটবে, আর সেখানে তারা কেমন অবস্থাতে রয়েছে তা তুমি একরকম মানসিক দৃষ্টির দ্বারা দেখতেও পাবে। কিন্তু মনোরাজ্য ছাড়িয়ে সে যদি চৈত্যরাজ্যে চলে যায়, তখন আর তোমার চিন্তার দ্বারা তার নাগাল পাবে না; তখন তোমাকে সেই চৈত্যরাজ্যে যাবারই উপায় জানতে হবে, তবে তার সাক্ষাৎ পাবে।

মনেরও একটা নিজস্ব দৃষ্টিশক্তি রয়েছে; সে দৃষ্টি এমনি

খোলা চোখের দৃষ্টি নয় কিন্তু তবুও সে এক রকমের দৃষ্টি, অর্থাৎ কোন জিনিসের আকারটিকে স্পষ্ট দেখার মতই অনুভব করা। সেখানে শুধু কল্পনা নয়, তার থেকে এক স্বতন্ত্র রকমের ক্রিয়া। মনে কর তুমি একটি আদর্শ পুরুষের কল্পনা করলে, যত রকমের উৎকৃষ্ট গুণ মানুষের থাকতে পারে সবই তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। তুমি বললে, সে এমন হবে, তেমন হবে, তার চিন্তাধারা এমন হবে, তার চরিত্র এমন হবে ; সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সুব্যবস্থিত করে তোমার আদর্শ মানুষটিকে দাঁড় করালে। একেই বলব কল্পনার দ্বারা অনুষ্ঠিত কাজ, সাহিত্যিকরা আর ঔপন্যাসিকরা এই ভাবেই তাদের চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করে। অবশ্য লেখকেরা বাস্তব জীবন থেকেই অনেক উপাদান সংগ্রহ করে ; কিন্তু কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টিকেই জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলে। কোন চরিত্রকে বা আবহাওয়াকে বা ঘটনাপ্রবাহকে তারা সম্পূর্ণই নিজেদের মন থেকে তৈরি করে। তারা যদি তেমন শক্তিমান হয় আর সৃষ্টিশক্তিও যদি তাদের তেমন জোরাল থাকে, তারা কল্পনাতে যেমন গড়েছিল ঠিক তেমনি মানুষকে পরে বাস্তব জগতেও প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

তোমার কল্পনাশক্তিকে তুমি কিছু বড় রকম উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগাতে পার। এমনকি ওর সাহায্যে তোমার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনকে নতুনভাবে গড়ে নিতে পার। বস্তুত: জগতের সব জিনিসকেই সৃষ্টি করবার ও গড়ে তোলবার পক্ষে তাই হল সবচেয়ে সাধারণ ও মৌলিক উপায়। আমি তাই বলি যে কল্পনাশক্তি না থাকলে কেউ কোন বিশেষ উন্নতি

এনে ফেলতে পারে না। কল্পনা চলে জীবনস্রোতের আগে আগে। নিজের সম্বন্ধে ভাবতে গেলে স্বভাবতঃই তুমি কল্পনা করতে থাক যে ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কতখানি কি হয়ে দাঁড়াবে—সেই পূর্বদৃষ্টিটাই তোমার মধ্যে আগে আসে, তার পরে তুমি তাকেই অনুসরণ করে চলতে থাক ; এইরূপেই তোমরা ভবিষ্যতের কল্পনা কর এবং সেই কল্পনাকে সফল করে তোল, তারপর সেটি সফল হয়ে গেলে আবারও কল্পনা কর। বস্তুতঃ কল্পনাই সাফল্যে পৌছবার প্রথম রাস্তা খুলে দেয়। যারা কল্পনা করতে আদৌ পারে না, তাদের কোন দিকে অগ্রসর করান খুবই কঠিন। তাদের নাকের সামনে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততটুকুই তারা দেখবে, উপস্থিত মুহূর্তে যেটুকু জানা যাচ্ছে সেইটুকু নিয়েই তারা চিন্তা করবে। অতি-প্রত্যক্ষ বর্তমানের মধ্যেই তারা আবদ্ধ, ওর চেয়ে এক পা-ও এগিয়ে যেতে পারে না। কল্পনার অভাবে তারা গতানুগতিক। কল্পনাতেই মানুষের মধ্যে যত কিছু প্রভেদ ঘটাতে পারে।

যারা বৈজ্ঞানিক হয় তাদের প্রচুর কল্পনাশক্তি থাকে এবং তা থাকাই দরকার ; নতুবা তারা কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারে না। কল্পনা হল বর্তমানের প্রাপ্ত অবস্থা থেকে আরো বেশি প্রাপ্তির দিকে আগ বাড়িয়ে নিজেকে উদ্গত করে দেবার শক্তি, আর এই শক্তির দ্বারা অপ্রাপ্তকে নিজের দিকে টেনে আনা। তবে কল্পনা দুই জাতেরও হতে পারে, পুরবর্তী ও প্রত্যাবর্তী, এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে যাওয়া। এমন লোকও আছে যারা সর্বক্ষণ যত রকমের বিপদ ও সর্বনাশ ঘটার কল্পনা করছে, আর তাদের তাই টেনে আনার মত শক্তিও আছে।

যাই হোক, কল্পনার দ্বারা অনেক ভাল কাজও হয়। ওটি যেন কীটপতঙ্গের শুঁড় বের করার মত ব্যাপার। শুঁড় চলে যায় অলব্ধের রাজ্যে, সেখানকার কিছু জিনিসকে কাছে টেনে আনার জন্য। ওতে পার্থিব জগতের আয়ত্ত সীমার গণ্ডি প্রসারিত হয়, এমন সব জিনিস এর মধ্যে এসে পড়ে যাতে এখানকার অভিব্যক্তির মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কল্পনা আমাদের এমন এক অস্ত্র যাকে সুকৌশলে চালাতে শিখলে ইচ্ছামত অনেক দরকারী কাজে লাগান যায়। এ মানুষের এমন এক শক্তি যার যথেষ্ট অনুশীলন ও সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত।

এমনকি তুমি ভগবানকে কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটাতে পার। বস্তুতঃ যাকেই তুমি ভালভাবে কল্পনা করবে তার সংস্পর্শেই আসতে পারবে। একথা কি তোমাদের জানা আছে যে, আদৌ যার কোন অস্তিত্ব নেই তেমন জিনিসকে কিছুতে কল্পনাই করা যায় না? যে জিনিসের কল্পনা তোমার মাথায় আসবে, তেমন জিনিস এই পৃথিবীতে না থাকতে পারে, কিন্তু কোথাও না কোথাও তা নিশ্চয়ই আছে। বিশ্বের কোনখানে যা নেই, অন্ততঃ যার কোন সূত্র নেই, তেমন জিনিসকে কল্পনা করা অসম্ভব। ভাবনা রূপেও তেমন জিনিস থাকতে পারে না।

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে ক্রমশ আগের দিকে। উত্তরোত্তর নতুন নতুন জিনিস এখানে নিত্যই অভিব্যক্ত হচ্ছে। এখন কল্পনা হল এমন এক শক্তি যার জোরে তুমি আপাত অভিব্যক্ত জিনিসগুলির সীমা লঙ্ঘন করে অনভিব্যক্তের রাজ্যে যেতে পার; সে কাজে যদি তুমি এতটাই উন্নত হও যে আজও যা

অভিব্যক্ত হয়নি তাকেও এখানে টেনে আনলে, তাহলে তেমন জিনিসকে এখানকার তালিকার অন্তর্গত করে আনার পক্ষে তোমার খানিক সাহায্য করা হল। অবশ্য বাস্তবের জগতে আজও যা অনাগত রয়েছে তেমন জিনিসকে কল্পনা করতে পারার ক্ষমতাটি তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। তেমন জিনিস এখনও বিস্তর আছে।

তেমন কোন নতুন জিনিসকে কল্পনার জোরে এখানে টেনে আনতে হলে প্রথমেই তোমার জানা দরকার কেমন করে এখানকার বর্তমান বাস্তবের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে যেতে হয়। একবার ভেবে দেখ, কত লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে এসে তবেই পৃথিবী এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাহলে ইতিপূর্বে এখানে একে একে কতই নতুন জিনিসের আমদানি হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই তা অসংখ্য অগণন। কারণ আমরা দেখছি যে কোন দুটি জিনিসের মধ্যে যতই সাদৃশ্য থাক তবু দুই জিনিস কখন ঠিক এক রকমের হয় না। প্রত্যেকটাই কিছু স্বতন্ত্র রকমের। অতএব এখানকার এই বিরাট পরিস্থিতিকে ছাড়িয়ে চলে যেতে পারা তোমার মনের পক্ষে খুব সহজ কাজ হবে না। তবুও তাতে সক্ষম হতে পার, যদি এই বিশ্ববৈচিত্র্যের গণ্ডি কতখানি তা আগে জেনে নিয়ে অতঃপর তার থেকে বেরিয়ে পড়। সেই আদিপর্ব থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু এখানে ঘটেছে তার সংস্পর্শে তোমাকে আসতে হবে, শুধু পৃথিবীর নয় কিন্তু এই পৃথিবী যার ভিতরকার এক ক্ষুদ্র কণিকামাত্র সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্বাপর সব কথাই জানতে হবে—কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হবে না। তোমাকে উঠে যেতে হবে তাকেও ছাড়িয়ে, যেতে হবে

সেই বিশ্বাতীত পরাৎপরে, যা সম্পূর্ণই অজানিত অনভিব্যক্ত। তবেই তুমি তোমার কল্পনার জোরে এখানকার অভিব্যক্তির মধ্যে নতুন কিছুকে নামিয়ে আনতে পারবে। তেমন যে একেবারেই করতে পারা অসম্ভব তা নয়। তবে তা নিতান্ত সহজ কাজ নয়।

কবিতা ও কাব্যপ্রেরণা

আমি বলেছি : "কবিতা মনের একরকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি।" কেমন করে? তার কারণ ভাবের একটা কিছু আকারগত প্রতিমূর্তি নিয়ে তার সঙ্গে কবিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—অর্থাৎ ভাব থেকে মূর্ত হয়ে ওঠে তার একটা রূপ বা প্রতিফলন, প্রতিমূর্তি, সংবেদন এবং তার থেকে আসে তদুপযোগী প্রভাব ও প্রক্ষোভ। এগুলিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করবার মত জিনিস বলেই ধরতে হবে। তার সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাও মনের দ্বারা এক রকম উপভোগেরই ব্যাপার।

মনের ও চিন্তার ভাবধারা নিয়েই কবিতার কারবার। ভাবের জগতে তার প্রবেশ ভাবরূপের ভিতর দিয়ে, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সংবেদন ও প্রক্ষোভ জড়িত থাকে তারই ভিতর দিয়ে। দর্শন বা অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন শুধুই ভাবের ও তত্ত্বের গভীরে চলে যেতে হয়, কবিতার ক্ষেত্রে তেমন নয়। কাব্যের ব্যাপারে ভাবকে যতক্ষণ পর্যন্ত রসাত্মক রূপ দিয়ে তার মধ্যে উপভোগ্য রসের আবেদন না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কাব্যই হবে না। এই সত্য কথাটি আমি একটু রূঢ় ভাবেই বলেছি, যাতে আমার বক্তব্যের অর্থটা ধারাল হয়। যারা স্থূল জীবনের উপভোগ্য জিনিসগুলিকে নিয়েই মত্ত থাকে, কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই যারা বস্তুজগতের বিভিন্ন আকারগত ও ক্রিয়াগত রূপরসাদির সম্ভোগ নিয়ে জীবন কাটায়, তাদের আমরা বলি ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সেই একই জাতের প্রবণতা যখন বাহ্যজীবন ও বস্তুজগতের দিকে না ঝুঁকে কেবল মনোগ্রাহ্য

বিষয়বস্তুর দিকে ও মনের দ্বারাই উপভোগ্য ভাবগুলির দিকে ঝোঁকে, তখন তার থেকে জন্মায় কাব্য। কাব্যের জগতে যত রূপ ও সৌন্দর্য নিয়েই কারবার। কবিতায় প্রকাশ করে ভাবের সৌন্দর্য, চিন্তার বিচিত্র রূপ ও ছন্দ, এগুলিকে তা একটি বাস্তব ধরনের আকার দেয়, একটা কিছু প্রতিমূর্তি হাজির করে ; তার মধ্যে রূপের লীলা, ধ্বনি ও বাক্যের লীলা। ওতেই বস্তুগত সম্ভোগকে বাদ দিয়েও মনোগত সম্ভোগ হতে থাকে। তাই বলে এ কথা আমি নিন্দা হিসাবে বলছি না কিংবা তাকে নৈতিক অন্যায় কাজ বলেও বলছি না ; যথার্থ যা হয়ে থাকে কেবল তারই বর্ণনা করছি।

এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে এই কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তাতে সত্যদর্শনের পক্ষে কোন বাধা জন্মাবে। যারা কবি হয় তাদের ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই থাকে। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে একটা ভাল কবিতার বই আর একটা দার্শনিক বই-এর মধ্যে কোনটা পড়তে চাই, তাহলে আমি কবিতার বইখানাই বেছে নেব, যেহেতু তা অন্ততঃ কম নীরস হবে! বস্তুতঃ কবিতার ঐ সংজ্ঞাটি দিলাম দূষণীয় হিসাবে নয়, সত্যের বিবৃতি করেই বলছি যে কাব্য হল সত্যকে রসাত্মক ভাবে সম্ভোগ করার এক দৃষ্টিভঙ্গি। কথাটা হয়তো একটু শ্রুতিকটু হয়ে গেল ; কিন্তু এর উদ্দেশ্য কেবল চিন্তাকে জাগান, সত্যের দিকে চোখ ফেরান, যাতে কাব্যের নাম শুনলেই একটা পূর্বসংস্কারগত "ধোঁয়াটে" ভাব সত্যদৃষ্টিকে অবরুদ্ধ না করে।

আর কাব্যপ্রেরণা ? তার মানে যদি বল যে কাব্যরচনার সময় কবিকে কোন চিন্তাই করতে হচ্ছে না, তার মনটি চিন্তার

অতীতে গিয়ে একেবারে নিস্তরঙ্গ নীরব হয়ে রয়েছে, মনকে সে উপরের বা গভীরের দিকে মেলে ধরেছে আর সেখান থেকে যা আসছে তাই অবলীলাক্রমে লিখে যাচ্ছে—এমন জিনিস বাস্তবিক হতে পারে হয়তো হাজার বছরে একবার। এমন জিনিস সাধারণ নয়। অবশ্য যোগীদের মধ্যে ঐরূপ শক্তি থাকে। কিন্তু তোমরা এমনিতে যাকে কাব্যপ্রেরণা বল সে হল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যাদের কিছু প্রতিভা থাকে, উপরের স্তরে যারা উন্মীলন পায়, তাদেরই বলা হয় "প্রেরণা-প্রাপ্ত" ; যারা কোন কিছুর আবিষ্কারক হয় তারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যখনই তুমি এমন কিছু নিয়ে কাজ করবে যা সাধারণ মানব চেতনার চেয়ে উপরকার জিনিস, তখনই তুমি প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়ে তা করতে পারবে। যখনই তুমি সাধারণ স্তরের শিকল ছিঁড়ে উপরে উঠবে তখনই সেখান থেকে "প্রেরণা" পাবে। কবির বেলাতেও ঠিক তাই। তার কাব্যসৃষ্টির মূলটি থাকে সাধারণ মনের উঁচুতে; ওর জন্য তার মনকে শূন্য বা নীরব করার দরকার হয় না।

দিব্যজীবনের কথা

যা আমরা এখনও হইনি কিন্তু অতঃপর হতে চাই, উপস্থিত যা করা আমাদের পক্ষে সাধ্য এবং সম্ভব হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি উচ্চতর যে জিনিস, যা আপাতত আমাদের নাগালের এবং ধারণারও উর্ধ্বে, তাকেই বলি "দিব্য"।

নিশ্চিত বলতে পারি যে এখন যদি আমরা কয়েক হাজার বছর অতীতের যুগে ফিরে যাই, তাহলে দেখব যে সেই অবস্থাতে থেকে তখন যাকে আমরা দিব্য বলছি বা ভগবান বলছি, তা হল "অধিমানস" স্তরের দেবতাগণের কাছাকাছি জিনিস। কিন্তু এখন জানছি, সেই অধিমানস স্তরের দেবতারা যদিও জগৎকে বহুকাল থেকে পরিচালনা করে আসছেন এবং পৃথিবীতে অনেক কিছুর সৃষ্টিও করেছেন, তথাপি এখন আমরা যাকে বলি অতিমানস তা ওর চেয়ে অনেক উঁচুতে, আর সেই অধিমানস হল এই অতিমানসের চেয়ে অনেক নীচুতে। আবার এই অতিমানস, যাকে আমরা এখন ভগবান বলছি আর যাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে চাইছি, এরও অবস্থা তাই দাঁড়াবে আরো কয়েক হাজার বছর পরে, যেমন এখন আমাদের কাছে অধিমানসের হয়েছে।

অর্থাৎ আসল কথা এই যে অভিব্যক্তির ও ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে ভগবানও সরে সরে যাচ্ছেন, তিনিও এগিয়ে চলেছেন। যেখানে তিনি সকল অভিব্যক্তির বাইরে এবং সব কিছুর অতীতে, সেখানে তিনি যে কি ও কেমন তা আমরা ধারণা করতে পারব না। কিন্তু যেখানে তিনি নিত্যসম্ভূতির ক্ষেত্রে এসে নিজেকে

অভিব্যক্ত করে চলেছেন, সেখানে উত্তরোত্তর নিজেকে তিনি বিকাশই করে যাচ্ছেন, আর তা এমনভাবে যেন সব শেষে দেখাবার মত আরো কিছু বাকি রাখছেন, যা নাকি তাঁর সত্তার সৌন্দর্যবিকাশের সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা হবে।

তাই জগৎ যতই অগ্রসর হয়ে চলেছে ততই তাঁর উপস্থিত অভিব্যক্তিকে পিছনে রেখে দিব্যের সীমারেখা উত্তরোত্তর আরো অগ্রসর হয়ে চলেছে।

শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সে তাদেরই বোঝাবার জন্য, যারা জগৎ বিবর্তনকে বাহ্য চেতনা দিয়ে দেখছে এবং যারা জানে যে এই পার্থিব জগৎ ক্রমবিবর্তনের ফলে কেমন ভাবে ধাপে ধাপে এখনকার বর্তমান অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে,—তাদের তিনি এই কথাই বলতে চান যে, এখনকার মন-প্রধান মানুষদের নিয়ে যে সৃষ্টি তোমরা দেখছ, অতিমানস চেতনা রয়ে গেছে তার চেয়েও বড় জিনিস, যা এর পর আসবে। মনের চেয়ে আরো উঁচুস্তরের জিনিস বলেই তিনি তার নাম দিলেন অতিমানস।

কিন্তু আমরা এখানে এ-কথাও বলতে পারি যে ইতিপূর্বে ভগবানের যতটা পর্যন্ত অভিব্যক্তি হয়েছে, ওটি হবে তার তুলনাতেই আরো বেশি দিব্য। কারণ ভগবানের দিব্যত্বের তো কোন সীমা নেই, তিনি হলেন অসীম অনন্ত, পরাৎপর। সুতরাং তাঁর পূর্ণতার সীমাও উত্তরোত্তর বেড়ে বেড়েই চলবে। আজকের দিনে যাকে আমাদের অপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, তখনকার ইতিহাসের লোকেরা এই অবস্থাতে পৌঁছবার জন্যই কত আকিঞ্চন ও আস্পৃহা করেছিল।

এ ক্রিয়া যে একটা কোথাও গিয়ে থেমে যাবে তারও কোন কারণ নেই। কোথাও গিয়ে থামা মানেই সব কিছু সেখানে ফুরিয়ে গেল—অগত্যা তখন আবার নতুন প্রলয়।

পূর্ণতা ও ক্রমোন্নতি

পূর্ণতা হল আপেক্ষিক কথা। বর্তমান বা অতীতের তুলনাতেই একটা কোন অবস্থাকে আগের চেয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বলা যেতে পারে ; যা এখনও অনাগত তার সম্বন্ধে ও কথা বলা যায় না। সৃষ্টি মানেই অবিরাম অগ্রগতি, অনন্ত প্রগতি। যতবারই পৃথিবীতে কোন নতুন চেতনার আমদানি হয়েছে, ততবারই তখনকার মানুষদের মনে হয়েছে যে এবার বুঝি সৃষ্টি তার শেষ পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছাল অন্তুতপক্ষে একটা অভূতপূর্ব অভাবনীয় উন্নতি ঘটে গেল।

কিন্তু আমাদের এইটুকু ভেবে দেখা উচিত যে জীবজন্তুরা নিজেদের তুলনায় মানুষদের সম্বন্ধে কি বিবেচনা করে ; একটা হাতী কিংবা কুকুর মনে করবে যে মানুষের শক্তির কোন তুলনা নেই ; কুকুররা ভাবে যে মানুষরা বুঝি দেবতার কাছাকাছি। ঠিক সেই ভাবেই এখনকার মানুষরা যে অবস্থাতে রয়েছে তার চেয়ে উচ্চতর অবস্থা কেমন হতে পারে সে বিষয়ে কিছু ধারণা পায় ; তাই আমরা বর্তমানকে নিয়ে কিছুতেই খুশি হতে পারি না, যতই উন্নতি করি ততই মনে হয় আরো কিছু যেন বাকি রইল, হবার আসল জিনিসটাই এখনও হতে বাকি রয়েছে, আমরা তাকে পাবার জন্যই অনবরত ঘোরাঘুরি করছি কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছি না। এর থেকে এইটুকুই বোঝায় যে মানুষ এর চেয়ে আরো কিছু উন্নতির জন্য তৈরি হয়ে উঠেছে। তা যদি না হ'ত, যতটা পর্যন্ত তার ক্ষমতা তাই নিয়েই যদি সে বেশ খুশি থাকত, তাহলে যে কাজ তার পক্ষে

সাধ্য তাই নিয়েই নিশ্চিন্তে লেগে থাকত, হয়তো তারই আরো কিছু উৎকর্ষ আনতে চেষ্টা করত, কিন্তু সে চেষ্টা হ'ত একই ব্যাপার নিয়ে এবং একই রাস্তা ধরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তো হচ্ছে না : মানুষ আরো বেশি কিছু খুঁজছে, যা এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, যা একেবারে খাঁটী সত্য, যার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এর চেয়ে যা টেঁকসই, যার উপর পা রাখলে কিছুতে ভেঙে পড়বে না, যা অবিনশ্বর, চিরন্তন হিমালয়ের মত। কেউ যখন একটা নবতর চেতনা পাবার জন্য তৈরি হয়ে ওঠে, কেবল সেই সময়েই তার মনে এমন শাশ্বতের নাগাল পাবার খোঁজ, এমন চূড়ান্ত বস্তুর ও চরম সৌন্দর্যের সন্ধানে ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগে।

অনেক কাল থেকেই এ ভাব এসেছে, হয়তো প্রথম দিক থেকেই—যদিও অবশ্য বিবর্তনের শুরু থেকেই নয়, কারণ মানুষ দেখা দেবার আগেকার যুগে যে অন্তবর্তী কাল চলেছিল তাতে অন্যান্য অনেক রকমের সৃষ্টি করে দেখা হচ্ছিল, সেই সব সৃষ্টি অনেকটা জন্তুদের পর্যায়েই ছিল ; কিন্তু আমি বলছি যখন থেকে এমন পরিণত ধরনের মানুষ জন্মাতে থাকল যারা উপর থেকে কোন চেতনা এলে তাকে গ্রহণ করে নিতে সক্ষম হবে—সেই তখন থেকেই এমন সব মানুষ এখানে দেখা গেছে এবং এখনও দেখা যাচ্ছে যারা সব কিছু ছেড়ে শাশ্বত ও চরম সদ্‌বস্তুরই সন্ধান করে। কিন্তু সমষ্টির বেলাতে সে কথা নয়, সমষ্টির বেলাতে কেবল অতি মন্থরভাবে ও ক্রমে ক্রমেই বহু তমসার ভিতর দিয়ে এবং যুগে যুগে অল্পাধিক জ্ঞানদীপ্তির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠছে সেই উচ্চতর অস্তিত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

আজকের দিনে মানবজাতির সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধ ও মূঢ়তা এখনও বজায় থাকা সত্ত্বেও তাকে ছাপিয়ে উঠে ঐরূপ ধরনের চাহিদাই সাধারণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে : তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে এখন সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে।

হাঁ, এ-কথা ঠিকই যে মানুষ অনেক কাল থেকেই আশ্বাস-বাণী শুনে আসছে, "এমন জিনিস ঘটবে, এমন একদিন আসবে",—সেইরকম আশাই মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার বছর আগের থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে এবার নতুন রকম চেতনা জাগবে, নতুন রকম জগতের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে এবার দিব্যের অভিব্যক্তি হবে ; কিন্তু চিরদিনই তা ছিল ভবিষ্যতের ব্যাপার, কোন যুগবিপ্লবের পরে হয়তো তা ঘটবে। কেউ বোধ করেনি যে বাস্তবিক তা এখানেই হবে আর এখনই হবে।

এখন এর পরের ভবিষ্যৎটা যে বাস্তবিক কেমন রকমের হয়ে দাঁড়াতে পারে, সে কথা বোঝবার জন্য অধিকাংশকেই কিংবা সকলকেই হয়তো বিস্তর কষ্টকল্পনা করতে হবে। মানব-জাতির চেতনা তার বর্তমান অবস্থার পাকে পাকে এমনই জড়িয়ে রয়েছে যে এই গতানুগতিক জিনিসই হতে থাকা ছাড়া অন্যরকম নতুন কিছু হবার কথা তারা ভাবতেই পারে না। যখন অন্ততঃ এক দলও মানুষের মধ্যে এই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাতে দেখা যাবে যে এবার সেই পরিবর্তন আসাটা অনিবার্য, কারণ যা হয়ে গেছে এবং হয়ে চলেছে এমন অদ্ভুত অসঙ্গতির কাণ্ড চিরকাল চলতে পারে না, কেবল তখনই আসবে সেই অভিবাঞ্ছিত পরিবর্তন দেখা দেবার শুভমুহূর্ত, তার আগে নয়।

তথাপি একটা প্রশ্ন বাকি রয়ে গেল যে, সে পরিবর্তন সমষ্টিগত ভাবে সকলের মধ্যে দেখা দেবার আগে ব্যক্তিগত ভাবে বাছা বাছা কয়েকজনের মধ্যেই আসবে কিনা। কিন্তু ব্যক্তিগত সিদ্ধির কোনটাই সম্পূর্ণ হতে পারে না বা পূর্ণতায় গিয়ে পৌছতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত নবসৃষ্টির পরিচায়ক সমষ্টিচেতনার সঙ্গে তার কোন সংযোগ ও মিল না থাকছে। ব্যষ্টির ও সমষ্টির বিকাশ পরস্পরের উপর এতটাই নির্ভর করে যে, সমষ্টির আবহাওয়ার মধ্যে যেখানে কোন সাড়া নেই সেখানে ব্যক্তিসিদ্ধি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হবেই। পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে সমগ্র ভাবেই অগ্রগতির ধারাটিকে অনুসবণ করতে হবে, তবেই নবজগতের আবির্ভাব ও নবচেতনার স্ফুরণ হবে।

• সুতরাং ভবিষ্যৎ পরিণতি অন্ততঃ আংশিকভাবেও নির্ভর করছে তোমাদের নিজেদেরই উপর, ব্যক্তিগত দিক দিয়েও এবং সমষ্টিগত দিক দিয়েও। কিন্তু এ-কথা কি তোমরা নিজেদের মনে একবারও ভেবে দেখেছ যে সেই বাঞ্ছিত নবচেতনা বলতে কি বোঝায়, সেই নবজগৎ ও নতুন মানবজাতি কেমন রকমের হবে?

এ-কথা অনস্বীকার্য যে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে পৃথিবীর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। অবশ্য তার ফল যে সকলের পক্ষে ভালই হয়েছে এমন কথা বলা যায় না, বরং অনেক স্থলে অসুবিধার মাত্রা আরো বেড়েই গেছে। আর এ-কথাও অনস্বীকার্য যে পৃথিবীতে মানবজাতি এসে বাস করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ব্যাপারে যে জটিলতা তারা এনে ফেলেছে, তা তাদের নিজেদের পক্ষেও সন্তোষজনক নয়

কিংবা অপরদের পক্ষেও নয়। কিন্তু আবার অপর দিক থেকে দেখা যাবে যে সার্বজনীন উন্নতিও কিছু কিছু ঘটেছে, অন্যান্য নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়েছে। মানুষ এসে নিজেদের জীবনকে জড়িয়েছে জন্তুদেরও জীবনের সঙ্গে, গাছপালাদেরও জীবনের সঙ্গে, এমনকি ধাতু এবং খনিজ পদার্থের জীবনের মধ্যেও তার প্রভাব লেগেছে; এতে যে তাদের তরফের সুখসুবিধার মাত্রা কিছু বাড়ান হয়েছে সে কথা নয়; কিন্তু এতে ওদের জীবনধারাও কিছু বদলে গেছে। ঠিক সেই প্রকারে এবারেও তাই সম্ভব যে, অতিমানস সত্তা যেমনই হোক, তার যখন আবির্ভাব হবে তখন এখানকার পার্থিব জীবনধারা বর্তমানের চেয়ে আরো অনেক বেশি বদলে যাবে। আমরা হৃদয়ে মনে এই আশাই পোষণ করি যে পৃথিবীর বর্তমান দুঃখ দুর্ভোগ একেবারে ঘুচে না গেলেও তখন অনেকটাই কমে যাবে, এখানে বাস করা অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ ও সুখের হবে, অন্ততপক্ষে তা এখনকার মত অসহ্য না হয়ে সকলের পক্ষে অনেকটা সহনীয় হবে। এমন হওয়া খুবই সম্ভব। মানুষের মধ্যে যে মনশ্চেতনার ক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা ওর স্বধর্মের তাগিদে কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের তৃপ্তি এবং নিজের ভাল করার দিকেই ঝোঁক দিয়েছে, তাতে আর কোথাও কিছু দোষ ঘটছে কিনা সেদিকে ততটা ভ্রূক্ষেপই করেনি। কিন্তু অতিমানসের পালা এলে সে তখন কাজ করবে এমন স্বার্থপরতার চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে; অন্ততপক্ষে তাই আমরা আশা করছি।

তবে মানুষের জীবনকাল খুব অল্প, তাই স্বভাবতঃ তারা

নিজেদের অস্তিত্বপরিধির মাপে এই চায় যে ঘটবার যা আছে তা অল্পকালের মধ্যেই ঘটে যাক। তা চাইলেও সময় যখন আসবে তখনই তা ঘটবে; একটা কোন শুভ মুহূর্ত, একটা কোন বিশেষ তৎপরতা এসে পড়লেই তখন সে জিনিস বাস্তব হয়ে উঠবে। এক কালে তেমনিই একটা মুহূর্ত এসেছিল, যখন মনযুক্ত জীব পৃথিবীতে প্রথম দেখা দিল। তখনকার আরম্ভটা হয়তো খুব ছোট করেই হয়েছিল, নিতান্ত অপূর্ণ ও আংশিক-ভাবে এই নতুন জিনিস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এর আসল ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল তখন থেকেই। এখন আবার এই নতুন রকম জিনিসের বেলাতেও কেনই-বা তেমন হবে না?

যাঁরা অনেক আগের থেকেই এই শুভ সংবাদের কথা ঘোষণা করে আসছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মানবকুলের মধ্যে পরম জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ছিলেন। আর আমি তোমাদের এই কথাই জানাচ্ছি যে পৃথিবীর ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে এই শ্রীঅরবিন্দই এক রূপে বা অন্য রূপে, এক নামে বা অন্য নামে প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান পার্থিব রূপান্তরের আয়োজনে পৌরোহিত্য করে এসেছেন। এবারটিতে এসেও যদি তিনি এই কথা শুনিয়ে থাকেন যে এবার আসবে শেষ রূপান্তর, তবে নিশ্চয়ই তাই। নিশ্চয়ই তিনি সেটা জেনেছেন।

তাই যদি হয়, এবার শেষ রূপান্তরের সময় যদি এসে থাকে, তাহলে যারা ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে আছে কিংবা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলছে, তারাই হবে প্রথম অগ্রনায়ক। আশা করি তারা সংখ্যাতেও অনেক হবে। কিন্তু এখানে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে: এমন রূপান্তরের সম্ভাবনা

যদি অর্ধেক মাত্রও থাকে, তবু তার জন্য সকলেরই প্রয়াস করা উচিত। আমি তোমাদের অনেকবার জানিয়েছি যে, অনেকেরই জীবনে এমন মুহূর্ত এসে পড়ে যখন বর্তমান জীবন আর বর্তমান চেতনার ধারা তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, এ-জীবনের প্রতি তখন আসে দারুণ বিরাগ ও বিতৃষ্ণা; সে অবস্থাতে আর তিষ্ঠতে না পেরে তখন সমস্ত অন্তর ও প্রাণ দিয়ে, সকল শক্তি ও সকল প্রয়াস দিয়ে তারা সেই একটি শেষ সুযোগকে আঁকড়ে ধ'রে একটিমাত্র খোলা রাস্তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে,—যাতে কোন গতিকে তারা এ-পার ছেড়ে অপর পারে চলে যেতে পারে। তাদের মনে হতে থাকে, যখন এ-রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় পা ফেলতে পারব তখন কি পরম সান্ত্বনাই যে মিলবে! কোন ভারবোঝা, কোন আকর্ষণকেই ঝেড়ে ফেলে দিতে তখন বাধবে না, যদি নিজেকে হালকা করে নিয়ে সেই রাস্তাটিতে লাফ দিয়ে উঠে যেতে পারি। ঠিক এমনি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি জিনিসটাকে তোমাদের দেখতে বলি। এ হল সকল রকম অ্যাডভেঞ্চারের সেরা অ্যাডভেঞ্চার; কারো মধ্যে যদি খাঁটি অ্যাডভেঞ্চারের দিকে আগ্রহ একটুও থাকে তাহলেই সে বুঝতে পারবে যে এর জন্য সর্বস্ব পণ করা যায়। কিন্তু যারা ভয় পাবে, যারা ইতস্ততঃ করবে, যারা বলবে, "ছায়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে কায়া বিসর্জন হবে না তো?"—যদিও আমার মতে সেটি হল নিতান্ত নির্বোধের মত কথা,—অর্থাৎ যাদের মনোভাব এই হবে যে কাল কি মিলতে পারে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে না থেকে আজ যেটুকু মিলে যাচ্ছে সেটুকু ভোগ করে নেওয়াই সুযুক্তি, তাদের সম্বন্ধে আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি যে তেমন পরিবর্তন

যখন প্রকৃতই তাদের নাকের সামনে ঘটে যাবে তখনও সে জিনিস তাবা চোখে দেখতে পাবে না। তারা বলবে, "হতে পারে, কিন্তু আমরা ও সব কিছু গ্রাহ্যই করি না, ওতে আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই"। সে ঠিক কথাই, কিন্তু এর জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের পস্তাতে হবে কিনা তাই-বা কে জানে।

যাই হোক, ঐ জিনিসকেই বলতে চাই আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা। অর্থাৎ যদি তুমি এমন মনে করে থাক যে সেই নবচেতনাকে আয়ত্ত করা ছাড়া জীবনে অন্য কোন কিছু সত্যিকার কাম্য হতে পাবে না, এখন যে অবস্থাতে রয়েছ তা যদি তোমার নিতান্ত অসহনীয় বলে বোধ করতে থাক—কেবল নিজের তরফ থেকেই নয় কিন্তু সমস্ত জগতের তরফ থেকে, যদি সাধারণের মত তুমি নিতান্ত সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর না হও; তাহলে নিশ্চয়ই বুঝবে যে জগতের এই বর্তমান অবস্থাটি এমনিভাবে অনেক কাল ধরেই চলে আসছে, এখন এর বদল হওয়া খুবই দরকার হয়েছে, আর তার জন্য নিজেই সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তোমার দিক থেকে আর কোন কিছুই করবার নেই; আর তখন তুমি নিজের সর্বস্ব পণ করে, পিছনের দিকে না চেয়ে, কি হবে আর না-হবে তাই নিয়ে চিন্তামাত্র না করে, সোজাসুজি একেবারেই এই অপূর্ব অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপ দেবে। আর তাও বলি, অতলের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকার চেয়ে এইভাবে অতলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া ঢের ভাল।

মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধি

এ হল একটি ফুলের নাম, যাকে তোমরা সাধারণ চাঁপা ফুল বল, আমরা তারই নাম দিয়েছি "মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধি"। এই ফুলের ঠিক পাঁচটি করে পাপড়ি থাকে, লক্ষ্য করে দেখবে। প্রত্যেকটি পাপড়িকে এক এক বিশিষ্ট মানসিক গুণের বা চেতনাক্রিয়ার প্রতিভূ বলে ধরা হয়েছে। সেই পাঁচটি গুণ যদি একত্রে মেলে তাহলে তাতে মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধিলাভ হয়। সেই পাঁচ রকম বিশেষ গুণের নাম হল: (১) সমর্পণ, (২) ঐকান্তিকতা, (৩) বিশ্বাস, (৪) ভক্তি, (৫) আস্পৃহা। এ-নামগুলির অবশ্য অদল-বদলও করা যায়। এই ফুলটি যখন কাউকে আমি দিই, তখন সব সময়ে যে ঐ নির্দিষ্ট পাঁচটি গুণেরই ইঙ্গিত করি তা নয়। যে সময় যেমন মানুষকে ঐ ফুল দেওয়া হয় সেই অনুসারে গুণের নামগুলিরও কিছু অদল-বদল হতে পারে। তবে সাধারণ হিসাবে ঐগুলিই ধর্তব্য। কিন্তু যখন যাকেই দেওয়া হোক, আর পাঁচটি গুণের যেমন অদল-বদলই করা হোক, আগে তার মধ্যে সব সময়েই থাকবে ঐকান্তিকতা। কারণ ঐ গুণটি না থাকলে কারো পক্ষে এক পদের অর্ধেকও এগিয়ে চলার সাধ্য হয় না, সিদ্ধি তো দূরের কথা। ঐকান্তিকতা হল একেবারে গোড়ার কথা, ওটি থাকা চাইই।

এই ঐকান্তিকতা কথাটিকে অন্যভাবেও তর্জমা করা যেতে পারে, অর্থাৎ ওকে ঐকান্তিকতা না বলে স্বচ্ছতাও বলা যেতে পারে। যা বোঝাতে চাইছি তা একটু ব্যাখ্যা করে বলি।

আমার কাছে যখনই কেউ নতুন আসে তখন আমি তার

দিকে একবার চেয়ে দেখি, আমি চাই তার চোখের দিকে, দেখি তার চোখের ভিতর দিয়ে। যদি লোকটি ঐকান্তিক প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ তার ভিতরটা যদি স্বচ্ছ হয়, তাহলে চোখের ভিতর দিয়ে তার অন্তরটিকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু যদি দেখি যে চোখের মধ্যে কিছু মেঘের আড়াল আছে, তার পরেও সেখানে কোন দেওয়ালের বাধা কিংবা কালো পর্দা ফেলা, সেগুলি ভেদ করে আমার দৃষ্টিকে চলে যেতে হবে কিংবা স্থানে স্থানে ছিদ্র করে তবে পার হতে পারব, আর তেমন করে এগিয়ে গিয়েও হয়তো দেখব যে কঠিন ব্রঞ্জধাতুর এক দুর্ভেদ্য বাধা রয়েছে আমার সামনে, সেখানে আমি তার অন্তরটিকে খুঁজেই পাব না। সেখানে আমি জানব যে মানুষটি ঐকান্তিক প্রকৃতির নয়। ভাষার অর্থ অনুযায়ী তাকেই বলব, সে স্বচ্ছ নয়। অতএব ঐকান্তিকতা সম্পর্কে এই হল প্রথম কথা।

তার পরেই আর যেটি নিতান্ত থাকা দরকার তা বিশ্বাস। এর বদলে আরো একটি কথা আছে যার অর্থ অনেকটা সীমাবদ্ধ হলেও অন্ততঃ আমার কাছে তার অনেক দাম; সে কথাটি আস্থা। বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি ভগবানের উপর পুরো আস্থা না রাখ, কিংবা যদি তা হারিয়ে ফেলতে থাক, তাহলে ভগবৎ শক্তি কিংবা তাঁর কল্যাণের প্রতি তোমার বিশ্বাসটিও ক্রমশ কমে আসবে, আর ভগবানের আস্থাও তাতে নষ্ট হবে। সেখানে হবে তিন রকমের মারাত্মক প্রতিবন্ধক।

সচরাচর না হলেও এমন কখনো কখনো হয়ে থাকে যে, তুমি প্রথমে বললে ভগবানের উপর তোমার অটল বিশ্বাসের

কথা। এ বিশ্বাস তোমার আছে যে তিনিই সব কিছু করেন আর সব কিছু করতে পারেন, তোমার নিজের এবং আরো সকলের যেখানে যা ঘটছে সে তাঁরই হাত, তিনি ছাড়া কোন কিছুই হয় না,—কিন্তু এই মনোভাব নিয়ে চলতে চলতে অপ্রিয় কিছু ঘটতে দেখে কিছুকাল পরে আস্থার অভাবে ভগবানের নামে দোষ দিতে শুরু করলে, বলে বেড়াতে লাগলে যে তিনি অবিচারের কাজ করছেন, দয়ালু দেবতার মত না হয়ে নিষ্ঠুর দানবের মত তাঁর আচরণ, জগতে যত কিছু অন্যায় দেখা যাচ্ছে সমস্ত তাঁরই কারসাজি বা তাঁরই প্রশ্রয়ে হচ্ছে। এই হল একরকম।

কিংবা হয়তো তুমি বললে যে ভগবানে বিশ্বাস তোমার আছে বটে, কিন্তু জগতের গতিকে যেমন দেখা যাচ্ছে, এর সম্বন্ধে তিনি যে কিছু করতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ কোন আস্থা নেই। তুমি বললে: "প্রথম কথা, আমি তো নিজে অন্ততঃ কষ্টভোগ করছি, দুর্দশা আমার লেগেই আছে, দুনিয়ার মধ্যে সকলের চেয়ে আমারই বরাত মন্দ"—কারণ এমনি প্রত্যেকেই বলে থাকে যে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে তারই বরাত সব চেয়ে খারাপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কাজেই তুমিও বলবে—"জীবন আমার উপর বড়ই বিমুখ। তা ভগবান যদি যথার্থ ভগবানই হবেন, যদি তিনি দয়াময়, মঙ্গলময়, স্নেহময়, সর্বত্র সমদর্শী, তাহলে কেবল আমার বেলাতেই এত দুর্ভাগ্যের বরাদ্দ কেন ? অতএব তাহলে ভগবানকে অসাড় শক্তিহীন বলতে হয়। নইলে তিনি যদি দয়ালু হতেন আর তাঁর শক্তি থাকত, তাহলে কি আমাকে অযথা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হ'ত ?"

এই গেল দ্বিতীয় রকমের প্রতিবন্ধক। তৃতীয়টি আবার এই। অনেকে এমন আছে যাদের আত্মধিক্কারের মাত্রাটা কিছু বেশি, ভ্রান্তিবশতঃ যারা নিজেদের খুব ছোট করে দেখে, তারা বলবে: "ভগবান আমাকে তো একেবারে ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন, আমি কোন কাজেরই উপযুক্ত নই, দেখা যাচ্ছে যে আমাকে নিয়ে তিনি কিছুই করতে পাবেন না, অগত্যা হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার কোন গতি নেই।" এমনি একটা-না-একটা বিপত্তি প্রায়ই এসে জুটে যাবে, যদি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপর তুমি পুরোপুরি আস্থা নিয়ে না থাক।

তারপর তৃতীয় গুণ হল ভক্তি। অবশ্য ভক্তি খুবই ভাল জিনিস; কিন্তু ওর সঙ্গে আরো কিছু থাকা চাই, নইলে ওতেও অনেক রকম ভুল পথে গিয়ে পড়তে পার। কারণ ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজের আমিত্বটি থাকে লুকিয়ে। ভক্তির সুযোগ নিয়ে তোমার সেই অহংএর ভাবটি খুবই বেড়ে যেতে পারে। ভক্তি যখন করছ তখন তাকে তোমার নিজের জিনিস বলে ভাবছ, কেবল এই কথা মনে করছ যে কতই ভক্তি না আমি করছি, অর্থাৎ ভক্তিতেও তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখতে থাকলে, আর কারো কথা তুমি আদৌ ভাবলে না, এমনকি জগতের কথাও না, ভগবানের জন্য তোমার কোন কাজ করা উচিত আর তাঁর দয়াতে কোন কাজ তুমি করছ সে সব কিছুই ভাবলে না—পুরোপুরি হয়ে উঠলে আমিত্বময়। তারপর যখন দেখলে যে ভগবান কোন কারণে তোমার সেই ভক্তির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, তাঁর কাছ থেকে যেমন উৎসাহ আসা

প্রত্যাশা করেছিলে তার কিছুই হল না, তখন তুমি হতাশ হয়ে ঐ তিন রকম বিপত্তির খাদের মধ্যে গিয়ে পড়লে, যার কথা আগেই বলেছি। হয়তো তখন বললে যে ভগবান এমনিই নিষ্ঠুর—আমরা জানি এমন অনেক ভক্তের কথা যাদের সমস্ত রাগটা শেষে ভগবানের উপরেই গিয়ে পড়ে, তারা বলে যে তিনি আমার প্রতি বড়ই অবিচার করলেন, আমার ভক্তিকে তিনি অবহেলা করলেন ; কিংবা তারা মনে করতে থাকে, "আমি খুবই ভুল করেছি, আমি অনুপযুক্ত—তাই তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

তাই বলছি, ভক্তির সঙ্গে আরো একটি বিশেষ ভাব সর্বদাই জাগ্রত থাকা চাই—সে হল কৃতজ্ঞতা। তিনি যে সামনে আছেন, তিনি যে উপস্থিত রয়েছেন, এই তো পরম আশ্চর্যের কথা, এতেই আসা চাই এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ, এতেই এক দিব্য আনন্দে তোমার মন ভরে থাকবে ; এই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য যে তিনি আছেন, এখানে ভগবান বলে কেউ একজন রয়েছেন, জগতে যে সব সাংঘাতিক কাণ্ড দেখছি তাই নিয়েই জগতের সবটা নয়, এতেই তোমার মনে এক অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ উঠতে থাকবে। ভগবানের সেই দিব্য অস্তিত্বের কোন কিছু স্পষ্ট নজির যতবারই তোমার নজরে পড়বে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও সামান্য কিছু উপলক্ষের ভিতর দিয়ে যতবার তুমি তার স্পর্শ বোধ করতে থাকবে, ততবারই এক অপূর্ব রকমের সুতীব্র ও সুগভীর কৃতজ্ঞতার প্লাবনে হৃদয় তোমার ভরে ভরে উঠবে, আর তার আস্বাদটুকু এতই সুমধুর যে অন্য কোন আনন্দের তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। তাই

আমি বলছি যে শুধুই ভক্তি নিয়ে থাকা অপূর্ব জিনিস, তার সঙ্গে চাই এই কৃতজ্ঞতা।

অতঃপর আসা যাক ওর পরের বিষয়টিতে। সাহসিকতার সম্পর্কে একবার আমি বলেছি যে সাহস যদি থাকে তবেই পেতে পার অ্যাডভেঞ্চারের বিরল আস্বাদ, যাকে বলে অসমসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ। সেই অপূর্ব জিনিসের সন্ধানকেই বলে আস্পৃহা—তেমন আস্পৃহা তোমাকে কোন হিসাব বিবেচনা করার অবকাশ না দিয়ে পুরোপুরি গ্রাস করে বসবে, ফিরে আসবার কোন কিছু পথ না রেখে ভগবান খোঁজার মহা অ্যাডভেঞ্চারের যাত্রায় তোমাকে সে টেনে বের করে নিয়ে যাবে, কেবল তাঁর দৈবাৎ সাক্ষাৎটুকু পাওয়া নয় কিন্তু তার চেয়েও কঠিন অ্যাডভেঞ্চারে অগ্রসর হয়ে তুমি তাঁকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে চাইবে। এর মানে অজানা একটা অসম-সাহসিক লক্ষ্যের দিকে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, তখন আর পিছন দিকে ফিরে চাওয়া নয়, এমনকি মুহূর্তের জন্যও প্রশ্ন আসতে দেওয়া নয় যে এর ফলটা কি দাঁড়াবে—কারণ এ-প্রশ্ন যদি একবারও জাগে যে কোথায় গিয়ে পড়ব, তাহলে আর তোমার সেই ঝাঁপটি দেওয়াই হল না, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে সেখানেই রয়ে গেলে, পা দুটি তোমার সেখানেই এঁটে রইল, আর কেবলই ভয় হতে থাকল পাছে পা টলে যায়। তাই ঐ মনোভাবটিকে আমি অসমসাহসিকতা বলছি, কিন্তু ওর আসল নাম হল আস্পৃহা। বস্তুতঃ দুই জিনিস একত্রেই থাকে। প্রকৃত আস্পৃহার মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতাও রয়েছে।

এ পর্যন্ত আমরা চার রকম জিনিস সম্বন্ধে বললাম। এবার

পাঁচ দফার জিনিসটি ওর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই,—সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা। কারণ কিছুতেই হতাশ হব না এই পণ করে যদি হাজার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই প্রয়াসে লেগে থাকবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে না পার, কঠিন কাজ দেখে কিছুকাল পরে যদি এ-প্রয়াস ছেড়ে দিতে মন চায়, আঘাত পেতে থাকলেও যদি বিনা দ্বিধায় সকল আঘাতকে পকেটস্থ করে নিতে না পার—কারণ দোষত্রুটি আর ভুল কাজ তুমি অনেক কিছু করবেই আর সেজন্য তোমাকে বারেবারে আঘাতও খেতে হবেই,—তাহলে এ পথে তোমাকে বেশিদূর এগোতে হবে না : প্রথম মোড়ের বাঁকটি পেরিয়ে যেমনি দেখবে যে তোমার অভ্যস্ত ক্ষুদ্র জীবনধারাটির সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল, অমনি আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি সেইখানেই বসে পড়বে।

সহিষ্ণুতার বাহ্য অভিব্যক্তি হল অধ্যবসায়। অর্থাৎ একই কাজ দরকার হলে তুমি হাজার বার নতুন করে করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একটি পা এগিয়ে মনে করলে যে সেখানে এবার দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পেরেছ; কিন্তু এমন কিছু ঘটল যাতে দেখতে পেলে যে সেখানেও আগেকার বিপত্তিটা ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে। তুমি হয়তো ভেবেছিলে যে ও সমস্যা একেবারে চুকিয়ে ফেলতে পেরেছ, কিন্তু পরে দেখবে যে আবার তাই নিয়েও তোমাকে লড়তে হবে : হয়তো সে সমস্যা এবার একটু স্বতন্ত্র আকারে দেখা দিতে পারে, কিন্তু জিনিসটা সেই একই। তোমাকে বারেবারেই তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, একই রকম বিপত্তির প্রতিবন্ধকতা লক্ষবার অতিক্রম করে যেতে হবে।

তবেই তুমি শেষ লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবার জন্য তৈরি হয়ে উঠতে পারবে।

কিন্তু খুবই একটা দরকারী জিনিসের কথা এ-তালিকা থেকে বাদ রয়ে গেছে—সমর্পণ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে যোগের পক্ষে সমর্পণই হল সর্বপ্রথম ও নিতান্ত অপরিহার্য অঙ্গ। সমর্পণ না হলে যোগই হয় না। তাই আমরা বলি যে এটি ঐ পাঁচ গুণের তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়, ওগুলি আসবার আগেও যোগ আরম্ভ করবার পক্ষে সর্বপ্রথমেই এটি দরকার, এই নিতান্ত অপরিহার্য প্রথম পর্বটি থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। সমর্পণ সম্বন্ধে স্থিরসঙ্কল্প না হলে তুমি এ পথে পা দিতেই পারবে না। কিন্তু সেই সমর্পণকে সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ করে আনতে হলে তখন ঐ পাঁচটি গুণই থাকা দরকার। তাই বুঝেই আমি সকলকে ঐ উপদেশ দিয়ে থাকি। সব কিছুর শীর্ষে থাকবে সমর্পণ; কারণ পূর্ণযোগের প্রয়াস করতে গেলে সর্বপ্রথমে ভগবানের উপর সর্বসমর্পণের সঙ্কল্প করতেই হবে, ঐ হল একমাত্র পথ, ও ছাড়া অন্য পথ নেই। অতঃপর থাকা দরকার এই পাঁচ রকম গুণের মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয় ও পূর্ণতা।

কামনার উৎপত্তি

কামনার উৎপত্তি কোথায়? বুদ্ধ বলেছেন, অজ্ঞানতা থেকে। একথা প্রায় পুরোপুরি ভাবেই সত্য। কামনাতে সত্তার মধ্যে এমন একটি ভাবের উদয় হয়, যাতে মনে হয় যে আমার আয়ত্তের বাইরে যে জিনিস রয়েছে সেটিকে আমার নিজের হাতের মধ্যে পেলেই আমি তৃপ্ত হব। এ প্রকৃত ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতারই কথা, কারণ শতকরা নিরানব্বই জায়গাতেই দেখা যায় যে কাম্য বস্তুটি যেমনি পাওয়া হয়ে গেল অমনি তৃপ্তির বদলে তাচ্ছিল্য এসে পড়ল।

আমার মনে হয়, কামনার জন্ম হয়েছে—অস্তিত্বের প্রথম থেকেই নিজেকে কোনগতিকে বাড়িয়ে তোলার এক অদম্য অন্ধ প্রেরণা হতে। নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায় যে আত্মপ্রেম পর্যবসিত হয়েছে বাইরের কোন জিনিসকে বা অন্য কোন প্রাণীকে আত্মসাৎ করে নিজেকে ফাঁপিয়ে বড় করে তোলবার এক প্রবৃত্তিগত অনিবার্য প্রেরণাতে। এই যে বাইরের জিনিসকে আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি, এরই নাম কামনা। যদি তুমি নিশ্চেতনের অতি গভীরে তার তলদেশ পর্যন্ত চলে যেতে পার, তাহলে দেখবে হয়তো যে কামনার মূলে রয়েছে প্রেম: ওটি হল প্রেমেরই তমসাচ্ছন্ন নিশ্চেতন আদি অবস্থা। ওর মানে নিজেকে পরিবর্ধনের তাগিদ, বাইরের কিছুকে নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবার এবং গিলে ফেলার চেষ্টা, যাতে তাকে পেয়ে নিজে আরো খানিকটা বড় হতে পারা যায়। এখন মনে কর তুমি এমন কিছু দেখলে যা সুন্দর, সুদৃশ্য, মনোরম: তোমার মনে যদি

সত্য-চেতনা থাকে তাহলে সেটিকে কেবল দেখেই তুমি তৃপ্তি পাবে, তাতেই আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, তাতেই আপন চেতনার মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ স্পর্শ পেয়ে তার সৌন্দর্যকে যথেষ্ট উপভোগ করবে। আর সেখানেই তার চরিতার্থতা ও নিবৃত্তি হয়ে যাবে। আনন্দ মিলে যাবার পরে আর কিছুই তোমার দরকার হবে না। যারা শিল্পী হয় তাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই রকমই হয়ে থাকে। একটি সুন্দর মানুষের মধ্যে শিল্পী লোভশূন্য ভাবেই দেখে তার দেহসৌষ্ঠবের লালিত্য, তার রূপলাবণ্য, মনোরম দেহছন্দ ও গতিভঙ্গি, ইত্যাদি। তার চেয়ে বেশি আর কিছু সে চায় না। একটি সুন্দর জিনিস ঐভাবে দেখে নিলে, তাতেই সে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

সাধারণ মানুষ কিন্তু তার স্থূল চেতনাতে কোন একটি সুন্দর জিনিস দেখতে পেলে, তা মানুষই হোক বা অন্য সামগ্রীই হোক, তৎক্ষণাৎ বলে বসবে, "আমার ওটি চাই"। এ কিন্তু ভাল কথা নয়। আর অমন ধরনের চেতনা নিয়ে সৌন্দর্যকে তুমি উপভোগ করতেও পার না, কারণ সেখানে পাবার কামনারই দাহ সর্বক্ষণ তোমার মধ্যে জ্বলতে থাকবে। তাতে সত্যিকার উপভোগ থেকেও তুমি বঞ্চিত হলে, অথচ লাভ কিছুই হল না। কোন কিছুকে কামনা করে কখনও সুখ মেলে না বরং তাতে আরো কেবল অসুখীই করে তোলে।

বুদ্ধও সেই কথাই বলেছিলেন যে কামনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে তাকে বর্জন করে দেওয়াতেই বেশি আনন্দ। প্রত্যেকেই তোমরা এ বিষয়ে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে পার, তাতে কিছু নতুন অভিজ্ঞতাও মিলবে, যা যথেষ্টই চিত্তাকর্ষক।

যখন কোন কামনাকে তুমি বর্জন কর, তখন ভিতরকার চৈত্যসত্তার সঙ্গে তোমার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ও মিল হয়ে যায়, তাতেই ভোগের চেয়ে ত্যাগে অনেক বেশি আনন্দ মেলে। তা ছাড়া কামনা পূরণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে একটা তিক্ত বিস্বাদ এসে পড়ে। এমন কোন কামনাভোগই নেই যার অন্তে কোন তিক্ততা নেই, যেমন খুব বেশি মিষ্টি খেলেই তার পরে মুখটা তিক্ত হয়ে ওঠে। সকল কামনার প্রকৃতিই হল তাই। ওকে বর্জন করতেই চেষ্টা করবে, কিন্তু সত্যিকার আন্তরিকভাবে। বর্জন করার অছিলা নিয়ে তাকে নিজের মধ্যে আলাদাভাবে কোথাও লুকিয়ে রাখবে না। তাহলে কিন্তু অনেক দুঃখ পেতে হবে।

সাধনা

কৃচ্ছ্রসাধন

তোমরা দেখে থাকবে সন্ন্যাসীরা কেউ কেউ খোঁচা পেরেকের মাথায় শয্যা রচনা করে তার উপর শুয়ে থাকে। কেন তারা এমন কাজ করে? হয়তো মনে হবে, তারা যে মস্ত সাধু হয়েছে তাই দেখাবার জন্য। লোককে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এটা করছে, এই যুক্তি ধরেই সন্দেহ জাগে যে ওটি তাদের সাধুত্ব জাহির করার ভঙ্গি। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যারা প্রকৃত আন্তরিকভাবেই ঐরূপ করে থাকে, অর্থাৎ শুধু লোক দেখাবার জন্য নয়। সেখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে এর ভিতরকার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তারা সে প্রশ্নের উত্তরে বলবে, দেহের প্রতি তাদের যে কোন মায়া নেই এই কথাটাই তারা নিজেদের কাছে সর্বদা প্রমাণ করতে চায়। আবার অন্যেরা অন্যরকম কথা বলে: তারা আরো জোর দিয়ে বলে যে আত্মার উপর দেহের বন্ধন যাতে মুক্ত হয়ে যায় সেইজন্য দেহটাকে ঐভাবে পীড়ন করা দরকার। কিন্তু আমার মনে হয় যে ইচ্ছা করে নিজেকে কষ্ট দেওয়া প্রাণসত্তারই একটা বিকৃত বিলাস, এই বিকৃত বাসনার চরিতার্থতার জন্যই আপন দেহকে ঐভাবে পীড়ন করা হয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অনেক সময় আমি দেখেছি, শরীরের একটা জায়গাতে কোন আঘাত পেলে সেই জায়গাটা তারা আরো বেশি জোর করে চিম্‌টে ধরে, যাতে কষ্টের মাত্রা আরো খানিক বেড়ে যায়, আর তাতেই যেন তারা আরো বেশি আমোদ পায়। বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও দেখেছি —নৈতিক ধরনের নির্যাতনকে তারা ইচ্ছা করে টেনে আনে।

এ কোন অজানা কথা নয়। কেউ খুব কষ্ট পাচ্ছে শুনলে আমি তাদেব বলি, "তুমি যে এমন অসুখী তার কারণ তুমি নিজেই অসুখী হতে চাইছ। কষ্ট ভোগ করছ, কারণ কষ্টকেই তুমি ভিতরে ভিতরে পছন্দ কর, নইলে এমন কষ্ট তোমার হ'ত না।"

একে আমি অস্বাস্থ্যকর বলি, কারণ এ-জিনিস সুস্থ সঙ্গতি ও সৌন্দর্যবোধের বিরোধী; তীব্র সংবেদন পাবার জন্য এ এক অস্বাস্থ্যকর রকমের চাহিদা। চীনদেশে মানুষকে পীড়নের জন্য এক অত্যাচারের উপায় বেরিয়েছে তা কি তোমরা জান? জাপানে থাকতে চীনা জানে এমন কোন জাপানীকে সেই অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করি। সে বললে: "সুদূর প্রাচ্যের মানুষদের, এমনকি জাপানীদের পর্যন্ত অনুভূতি খুব ভোঁতা। এদের দেহে তেমন সাড় নেই; যন্ত্রণা তীব্র না হলে তাদের রীতিমত অনুভবই হয় না।" সেইজন্য তীব্র যন্ত্রণা পেতে তারা নানারকম বুদ্ধি খাটায়। যারা যতটা নিশ্চেতন বা তামসিক প্রকৃতির হয়, তাদের অনুভূতি তত বেশি ভোঁতা হয়; উত্তেজনা মাত্রই তাদের তীব্র হওয়া দরকার। তাই তারা প্রায় খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়, কারণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে উত্তেজনার তীব্রতা আছে। কাউকে পীড়ন করতে থাকলেই তোমার স্নায়ুগুলি খুব উত্তেজিত হবে: এই জিনিসটাই তারা চায়। এক এক জাতীয় মানুষ এই কারণে স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর হয়। মনের দিক দিয়ে বা অন্য কোন দিক দিয়ে না হলেও প্রাণের দিক দিয়ে তারা নিশ্চেতন, আর বিশেষতঃ দেহের দিক দিয়ে তারা অনেকটাই অচেতন।

যার সৌন্দর্যবোধ থাকে সে কি নিষ্ঠুর হতে পারে ?

এ এক মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ; কোন দিক দিয়ে সৌন্দর্যবোধ তারই উপর তা নির্ভর করে। দেহের, বা প্রাণের, বা মনের দিক দিয়ে? নৈতিকের তরফে যদি তোমার সৌন্দর্যবোধ অর্থাৎ শালীনতা ও সম্ভ্রমবোধ থাকে তবে কখনই তুমি নিষ্ঠুর হতে পারবে না। সেখানে তোমার প্রকৃতি হবে সূক্ষ্ম জাতের, কাজেই দয়াবান হতেই হবে। কিন্তু যে কথা আমি প্রায়ই বলি, মানুষের মধ্যে নানারকম ধাতু টুকরো করে জোড়া থাকে। যেমন বলি, শিল্পীদের মধ্যে আমি খুবই ঘুরে দেখেছি। গত শতাব্দীর শেষভাগের ও এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের সকল বড় বড় আর্টিস্টদের আমি জানতাম। তাদের মধ্যে মিশে দেখেছি, সৌন্দর্যবোধ তাদের খুবই উঁচুদরের ছিল। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে তারা অনেকেই ছিল নিষ্ঠুর। কারণ শিল্পী যতক্ষণ তার স্টুডিওতে ততক্ষণ সে আছে সৌন্দর্যের পরিবেশের মধ্যে, কিন্তু নিজের সংসারের মধ্যে ঢুকলেই তখন সে অন্য মানুষ, সেখানে সে আর আর্টিস্ট নয়। সেখানে সে অতি সাধারণ এবং ইতর। অনেকেই তাই। তবে তার মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে। কারো কারো ব্যক্তিত্ব সর্বত্রই এক, তাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই শিল্পীর, আর তারা প্রকৃতই সুন্দরচরিত্র ও উদার হয়।

কৃচ্ছ্র সাধনে কি কোনই উপকার নেই ?

তা ত আমার মনে হয় না। ওতে কোন কিছুর সংশোধন আসে না। তুমি হয়তো মনকে বোঝাবে যে এতে তোমার কিছু উন্নতি সাধিত হচ্ছে, কিন্তু এদিকে প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিসটাই

তুমি ছাড়তে পারনি। প্রমাণস্বরূপ দেখবে যে কৃচ্ছ্র অভ্যাস যখনই তুমি ছেড়ে দিলে তখনই আগেকার সব কিছু ব্যাপার আরো বেশি জোর করে এসে হাজির হল।

কিন্তু সমস্তই নির্ভর করে এ কথার অর্থটির উপর। যদি বল ওর মানে কামনাকে দমন করা, তাহলে তা কৃচ্ছ্র নয়, সে হল সমুচিত কাণ্ডজ্ঞান, এবং তা সুবুদ্ধি। কৃচ্ছ্র বলতে সাধারণতঃ বোঝায় উপবাস করা, দুর্দান্ত শীত বা প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে থাকা, ধারাল পেরেকের উপর শুয়ে থাকা, অর্থাৎ কোন উপায়ে দেহের নিগ্রহ করা। ওতে শুধু আত্মগরিমা কিংবা আধ্যাত্মিক অহংকারটাই বাড়ে, তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না। প্রকৃত সংযম কিংবা নিজের উপর কর্তৃত্ব ওর দ্বারা আসে না। সোজা উপায় ভেবেই লোকে এটা করে থাকে, কিন্তু ওতে নিজের গর্ব জিনিসটাই প্রশ্রয় পায়। ওর দ্বারা হয়তো তোমার কঠোর তপস্যাশক্তি দেখিয়ে দিলে, আর এদিকে ওর আড়ালে আড়ালে অনেক কিছুই লুকিয়ে রইল।

কৃচ্ছ্র তার দ্বারা দেহকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে, নীরবে অথচ দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে আপন কামনা-বাসনাকে বশে আনা, তার বেসামাল প্রবেগকে দাবিয়ে রাখা অনেক বেশি কঠিন। কোন একটা জিনিসকে আদৌ হাতের মধ্যে না আনার চেয়ে, যা আমার হাতের মধ্যেই আছে তার প্রতি অনাসক্তি রাখতে পারা অনেক বেশি কঠিন। অথচ এ নতুন কথা নয়, এই সহজ সত্যটি মানুষ আবহমান কাল থেকে জানে এবং মানে। স্বেচ্ছায় বিত্তহীন হয়ে থাকা কিংবা বিত্ত থাকলে তাকে ত্যাগ করে নিঃস্ব হতে পারা তত বেশি কঠিন কাজ নয়: কিন্তু সবচেয়ে

কঠিন হল বিত্তকে পুরোপুরি বজায় রেখেও তার প্রতি নিজের কোন আসক্তি না রাখা। এর নৈতিক মূল্য ওগুলির চেয়ে আরো উপরে। নিজে একবার চেষ্টা করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটি কত কঠিন : কোন জিনিস হাতে পেলে তখন সেটি নিয়ে নাও এবং তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করতে থাক, আবার যেমনি কোন কারণে সেটি হাত থেকে সরে যাচ্ছে অমনি বিনা দ্বিধায় তাকে যেতে দাও, ধরে রাখবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা ক'র না ; যাই আসুক তাকে প্রত্যাখ্যান করবে না, যাই চলে যাক তার জন্য ক্ষোভ করবে না—অবশ্য আমি বাস্তব জিনিসের সম্বন্ধেই বলছি, যেগুলিকে সাধারণ নিত্যকার জীবনের কাজে দরকার হয়।

দৈহিক কৃচ্ছ্রতায় কোন দোষই ঘোচে না, কারণ সে সব দোষ হল ভিতর দিকের। বাইরের জগতের সংস্পর্শকে তুমি ভয় কর তাই তাকে এড়াতে চলে গেলে গভীর জঙ্গলে, বিজন গুহাতে, পাহাড়ের চূড়াতে, যাতে সম্পূর্ণ একা হয়ে থাকতে পার। কিন্তু নিজের ঘাড়ের বোঝা কারো কাছে ধার করতে হয় না, একা থাকলেও নানারকম দোষ হয়ে তা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বস্তুতঃ নিজের মধ্যে যদি কোন দোষ না থাকত তাহলে অপরের কারো দোষ তুমি দেখতেই পেতে না। বাইরের থেকে তার সংক্রমণ এসে লাগে বটে, কিন্তু তার আসল কারণ তোমার নিজের মধ্যে রয়েছে তার জীবাণুর জড়। এ কথার মধ্যে অনেকটাই সত্য আছে যে মানুষের মধ্যে যে সকল বড় বড় উদ্বেগ-আবেগের ঢেউ খেলে সেগুলি তাদের নিজের ভিতর জন্মায় না। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হতে

পারে, তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যত ঢেউই এসে তাকে আঘাত করুক, তার দ্বারা সে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা স্পর্শিত হবে না। সে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকবে যে একটার পর একটা ঢেউ ভেসে চলে যাচ্ছে, যেমন আকাশের গা দিয়ে ঝড় ভেসে যায়, কিন্তু তার ধাক্কা আকাশ একটুও বোধ করছে না।

বাইরের গোলমালের প্রতিক্রিয়াতে যখন আমাদের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন তার মানে এই হয় যে তেমন বিপর্যস্ত হবার ভাবটি আগের থেকেই আমাদের মধ্যে জিয়ানো ছিল, নতুবা বাইরের কোন জিনিস ভিতরে ঢুকে একটুও দাগ কাটতে পারে না। লোকে যে ভয়ে আতঙ্কিত হয়—এক দল মানুষ একত্রে থাকলে তখন সকলেই একসঙ্গে ত্রস্ত হয়ে ওঠে—তার কারণও তাই। ওর মধ্যে যদি দুই-একজন ভয় না পেয়ে রুখে দাঁড়ায় তাহলে সেই সার্বজনীন আতঙ্ক নিবারিত হতে পারে, তখন আর তারা সহজে বাইরের কিছুতে বিচলিত হয় না। যারা অমন সাহসী হয় তারাই ভয়ের সংক্রামকতা থামিয়ে দিয়ে দলের সকলের ছত্রভঙ্গ হওয়া নিবারিত করতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গেছে। একটা উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, শক্তির প্রবেগ যে সকলের মধ্যে ছোঁয়াচে হয়ে ওঠে, তার কারণ আগের থেকে সকলের মধ্যেই তার প্রবণতা লুকিয়ে রয়েছে।

প্রকৃত উন্নতির চেষ্টাই-বা কেন আপনা থেকে আসে না, অন্ততঃ এই আশ্রমে আমাদের মধ্যে?

তার কারণ মানুষের দেহপ্রকৃতি স্বভাবতঃই তামসিক। প্রচেষ্টা যা কিছু জাগে তা প্রাণপ্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু প্রাণ যা

করে, তা কেবল নিজের তৃপ্তির জন্যই করে। দেহপ্রকৃতিকে যদি নিজের খেয়ালে চলতে দেওয়া হয় তাহলে সে নিজের থেকে কোন প্রচেষ্টাতেই ঘাড় দেবে না ; তার নিজের জন্য যদিও কিছু তৎপরতা রাখা দরকার হয়, কিন্তু তা খুব কমই।

আর এখানকার আশ্রমের কথা কিছু স্বতন্ত্র। এখানকার যা শিক্ষা বা রীতিনীতি তা মুক্ত স্বাধীনতার আদর্শে। সর্বাধিক স্বাধীনতা বজায় রাখার ভিত্তিতেই এখানকার জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ; নিয়ম কিংবা বিধিনিষেধ এখানে খুবই কম। বাইরের জগতের বাপমায়েরা যে ভাবে ছেলেমেয়েদের শাসন করে—এটা ক'র না, ওটা ছুঁয়ো না, এ কাজটি করাই চাই, ওটা কিছুতেই নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—তার সঙ্গে যদি এখানকার ব্যবস্থার তুলনা করে দেখ তাহলেই এ কথা বুঝবে। অন্যান্য স্কুল-কলেজেও এখানকার তুলনাতে অনেক বেশি বেশি কড়া নিয়ম আছে। সেই কারণেই, তোমাদের নিজে নিজে উন্নতি করে নেবার পক্ষে এতটা স্বাধীনতা দেওয়া আছে বলেই, তোমরা যখন খুশি উন্নতির প্রচেষ্টা করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পার, যেমন তোমাদের মন চাইবে। এখানে সে বিষয়ে তোমরা একেবারেই স্বাধীন।

এর মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ আপনা হতেই সেই প্রচেষ্টাতে লাগে। তাই চাই, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তারই দাম খুব বেশি। তোমার নিজেরই মধ্যে তার প্রেরণা এসেছে, নিজের থেকেই তোমার অন্তরে সেই দিকে ঝোঁক এসেছে, তাই তুমি চলেছ একটা উন্নতির পথে, বাইরের কারো নির্দেশে বাধ্য হয়ে তা করছ না। যা তুমি নিজের থেকে করছ তা একান্ত নিজেরই

ভিতরকার জিনিস। এমন কথা নয় যে ওটি করলে তোমার কিছু পুরস্কার মিলবে, না করলে শাস্তি হবে। অবশ্য এমন হতে পারে যে ওর কোন কিছু ফল দেখতে পাওয়াতে তুমি জানলে যে তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হচ্ছে, কিন্তু তারই আশা মনে নিয়ে তুমি সে প্রচেষ্টা প্রথমে শুরু করনি। এইরকমই হল ঠিক কাজ। বস্তুতঃ এখানকার ব্যবস্থাই তেমনি যে, তোমার নিজের কাজটুকু সম্পূর্ণ করতে পারলে আর তা ভাল ভাবে করতে পারলে তুমি নিজেই তাতে তৃপ্ত হবে, আর সেই হবে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার; আর তা যদি না কর কিংবা খারাপ ভাবে কর তবে নিজেই নিজেকে তার জন্য পুরোদস্তুর শাস্তি দেবে; তেমন শাস্তির চেয়ে আর কোন শাস্তিই নিদারুণ হতে পারে না। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে এইরকম ব্যবস্থাই সবচেয়ে ফলদায়ক ও দামী, বাইরের বিধান ও চাপের দ্বারা কখনই অতটা ভাল কাজ হতে পারে না।

আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলতে কোন জিনিসকে বোঝায়?

তা হল এমন জিনিস যাতে তোমার এখনকার চেতনার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর চেতনার সঙ্গে তোমার সংস্পর্শ ও মিল হয়ে যাবে। এখন তুমি এমন এক অবস্থার মধ্যে রয়েছ যার সম্বন্ধে তোমার নিজেরই কোন জ্ঞান নেই। একে বলে সাধারণ চেতনা। এর মধ্যে থেকে হঠাৎ তুমি অনুভব করলে যে তোমার ভিতর এমন কিছু প্রবেশ করেছে যা এই মামুলী অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ও অনেক উঁচুদরের জিনিস—তাকেই বলা যাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, তা সে যেমন

ধরনেরই হোক। মনের ধারণা দিয়ে তার সত্যাসত্য তুমি পরীক্ষা করেও দেখতে পার কিংবা নাও দেখতে পার, তুমি তার কিছু যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও করে নিতে পার কিংবা তা নাও কবতে পার, সে অনুভূতি হয়তো স্থায়ীও হতে পারে বা অস্থায়ীও হতে পারে, হয়তো ক্ষণিকের জন্যই তা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখ যে সেই চেতনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের, যাতে স্পষ্ট বুঝতে পার যে তা উপরের দিক থেকেই এসেছে, তা এখানের চেয়ে অনেক উপরকার জিনিস এবং তা সাধারণ অনুভূতিগুলির চেয়ে অনেক বেশি বিশুদ্ধ আর অনেক বেশি সত্য,—তবে তাকেই আমি বলব যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যদিও ঐ বাক্যের দ্বারা আরো হাজার রকমের জিনিস বোঝাতে পারে।

মানুষের জন্মগ্রহণ

গত সপ্তাহে আমি জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছি দেহের মধ্যে আত্মা গিয়ে কেমনভাবে প্রবেশ করে। আমি বলেছি যে প্রায় প্রত্যেকের বেলাতেই দেহটা প্রথম সৃষ্ট হয় নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে, যদিও এর ব্যতিক্রম থাকে কিন্তু তার সংখ্যা এতই কম যে উল্লেখযোগ্যই নয়। এ কথাটি উল্লেখ করেছি এই কারণে যে, এমন অদ্ভুত উপায়ে জন্ম নিতে হয় বলেই বাধ্য হয়ে মানুষকে অবান্তর জিনিসের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে পৃথিবীতে আসতে হয়, তারপর জীবনের পথে ভালভাবে অগ্রসর হতে হলে একে একে সেইসব অনেক বোঝাই ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে হয়। তার মানে আমি বোঝাতে চাইছি যে, অনেকটা জোর করেই তোমাকে তোমার বর্তমানরূপে এখানে এনে ফেলা হয়েছে, জোর করেই কতকগুলি স্বভাব তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমার জন্মার্জিত বংশগতির ধারাটিকে অনুসরণ করতে বাধ্য করান হয়েছে। এখন তোমরা জানতে চাও যে কার জোরে এমন কাজ হয়ে থাকে, সে কোন শক্তি? যতটা সম্ভব সোজা কথায় সে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

এক পুরুষ ও এক নারী, অর্থাৎ বাবা ও মা দুজনের দ্বারা কেবল দেহটি প্রথম সৃষ্ট হয়; সেই দেহের মধ্যে যে আত্মা প্রবেশ করবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তিসত্তাটিকে তারা পৃথিবীতে এনে ফেলবে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেও দেখতে পারে না যে এদের মধ্যে এসে জন্মান তার পছন্দ হচ্ছে কিনা, সেই আত্মার নিয়তির পক্ষে তা অনুকূল হচ্ছে কিনা। নিজেদের গতানুগতিক

ধারা অনুযায়ী তারা নবজাত সন্তানের উপর নিজেদের চরিত্র-গুলির অনুকৃতি আরোপ করে। তারপর এমন পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়ে তাকে মানুষ করতে থাকে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ওর ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কোন উন্নত বা পূর্ণবিকাশী আত্মা যদি ঐ দেহাধারের মধ্যে এসে অবতরণ করে, তবে তাকেও ঐ সকল জন্মার্জিত প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে অনেক লড়তে হয়। জৈব জন্মনিয়ম অনুযায়ী যে সকল পবিস্থিতি তাকে ঘিবে থাকে তার বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করে তবেই সে নিজের ঠিক রাস্তাটি খুঁজে পায় এবং তার পরে আপন সত্তাকে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে অবকাশ পেতে পারে।

সন্তান উৎপাদনের কাজটি এমন জন্তুদের মত না হয়ে বুদ্ধিমান মানুষের মত হোক জনক জননীদের পক্ষে সে উপায় কিন্তু করতে পারা সম্ভব। অর্থাৎ কেবল প্রবৃত্তি ও কামনার তাড়নায় আর এমনকি অনেক সময় সন্তান জন্ম দেবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা যে ভাবে সন্তান সৃষ্টি করে, তার বদলে সচেতন ইচ্ছা ও কল্যাণের স্পৃহা নিয়ে এমন প্রার্থনা করতে পারে যে তাদের দ্বারা যে সন্তান জন্মাবে সে যেন প্রবেশকামী আত্মাটির উপযুক্ত হয়। এমন মানুষদের কথা আমি জানি, সংখ্যায় বেশি না হলেও, তেমন মানুষ কেউ কেউ আছে—যারা বিশেষ শুভসময়টি মনোনীত করে, নিজেরা যথাযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়ে, ধ্যাননিষ্ঠা এবং আস্পৃহা এবং একাগ্রতা এনে, তাদের দ্বারা উপ্ত সন্তানবীজের মধ্যে এসে প্রবেশ করবার জন্য কোন সৎ ও বিশিষ্ট সত্তাকে আমন্ত্রণ জানায়; তবে এ সম্বন্ধে কিছু গুরুতত্ত্বও জানা চাই, যা সাধারণ লোকে জানে না।

প্রাচীনকালের কোন কোন সভ্যতার যুগে এবং এখনও কোন কোন দেশে এই রীতি প্রচলিত আছে যাতে সন্তানসম্ভবা নারীদের শান্তি ও সৌন্দর্যময় আরামদায়ক আবেষ্টনেব মধ্যে সবদিক দিয়ে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে। এমন ব্যবস্থাই সর্বত্র হওয়া উচিত, কারণ এটুকু ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য কাজ নয়। মানবজাতি যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, তাদের পক্ষে এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। অথচ বলতে গেলে সবাই একে অসাধারণ প্রস্তাব বলে মনে করবে, কারণ খুব কম লোকেই এই নিয়ে ভাল করে চিন্তা করে দেখে। সকলেই প্রায় চিন্তামাত্র না করে নিজেদের সন্তানের জন্ম দেয় এবং তারপর আর খেয়াল রাখে না। কিন্তু তাদের কাছ থেকে অন্ততঃ এইটুকু প্রত্যাশা করা যায় যে তারা যে কাজটি করতে যাচ্ছে তা যেন সচেতন হয়েই করে। আর সেই কাজের ফল যাতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হয়।

এখন, যে পূর্ণচেতন আত্মাটি গঠনের ও বিকাশের পথে যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে পৃথিবীতে আবার এসে বাস নিতে ইচ্ছুক হয়েছে; সে তার চৈত্যলোক থেকে এখানে খুঁজতে থাকে, কোথায় এসে ঢুকলে তার উপযুক্ত চৈত্যের আলো এখানে মিলতে পারে, আগের জন্মে যখন সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন থেকেই সেই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বেছে ঠিক করে রেখেছিল যে পরবর্তী জন্মে কোন অবস্থার মধ্যে সে ফিরে আসবে, সবিশেষভাবে না হলেও এবিষয়ে তার মোটামুটি একরকম সঙ্কল্প করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সঙ্কল্প ঠিকভাবে সফল হবার সুযোগ দৈবাৎ মেলে। এখনকার মানুষদের মধ্যে

অধিকাংশের বেলাতে এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা তোলাই যায় না। আমরা বলছি ক্রমবর্ধমান আত্মাদের সম্বন্ধে, যে আত্মা পরিণতির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চলেছে। এখন সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার পথেও বহু বহু স্তর রয়েছে, যে স্তরে ক্ষুদ্রতম একটি স্ফুলিঙ্গ সামান্য একটু আলোকরশ্মিতে প্রথম ফুটে উঠছে সেখান থেকে, যে স্তরে সত্তাটি পূর্ণ গঠন পেয়ে পূর্ণচেতন হয়ে উঠছে সেখান পর্যন্ত। এমনি স্তরের পর স্তর যাত্রার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি আত্মার পক্ষে তেমন পূর্ণচেতন সত্তায় পরিণত হতে, অর্থাৎ যে অবস্থায় এসে পৌছাতে পারলে সে নিজের নিয়তিকে নিজের ইচ্ছায় বেছে নিতে সক্ষম হবে, তেমন অবস্থায় আসতে তার অনেক হাজার বছর সময় লেগে যায়।

তেমনই কোন মুক্ত ও পূর্ণচেতন আত্মা যখন এই পৃথিবীতে একটি দেহাধারের মধ্যে ফিরে আসতে চায়, তখন সে জন্ম নেবার আগে থেকেই মনোনীত দেহটির উপর নিজের কাজ আরম্ভ করে দেয়। সেই কারণে ওর জন্মদাতা পিতামাতার অজ্ঞানতা থেকে যে সব প্রতিকূল পরিস্থিতি জমা হয়ে থাকে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে তার বাধে না। সে কোন বিশেষ কারণে ঐখানে আসাই স্থির করেছে, আন্দাজে বা অজ্ঞানতা হেতু নয়, ওখানেই সে কিছু আলোর সন্ধান পেয়েছে—যদিও তা সম্ভাবনা মাত্র, কিন্তু সেই আলোর সম্ভাবনাটুকু দেখতে পেয়েছে বলেই ওখানে সে আসছে। চৈত্যালোক থেকে পৃথিবীর মধ্যে খুঁজে খুঁজে জন্মগ্রহণের জন্য ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটিকেই বেছে নিলে, তখন বুঝতে হবে যে রীতিমত বিচার করেই সে তা করেছে;

সেখানে কোন মারাত্মক ভুল হবার কথা নয়, কিন্তু খুব বেশি ভুল না করলেও আব বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রেও যেখানে একটি চেতন আত্মার পক্ষে নিজের জন্য দেহ বেছে নিয়ে সেই দেহকে নিজের কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, সেখানে সেই দেহাধারটি এখনকার গতানুগতিক জান্তব প্রণালীতে জাত হলে, তার দরুন যে দোষগুলি তার মধ্যে এসে বর্তাবে, সেই দোষ-গুলিকে কাটিয়ে উঠতে ঐ আত্মার পক্ষে যে বিস্তর বেগ পেতে হবে তা বলা বাহুল্য।

ওর বর্তমান পিতামাতার তরফ থেকে আবার তাদের আপন আপন গঠন বৈচিত্র্যের দিকটাও রয়েছে, তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের ভালমন্দের প্রশ্নটাও রয়েছে ; তারা খুবই ভাল হলেও তাদের বংশধারার পূর্বানুকৃতি, তাদের পূর্বাভ্যাসগত চরিত্রের ছাঁচ, তাদের চেতনা ও অবচেতনার জটিলতা, জন্মগত পরিবেশ ও জীবনযাত্রার প্রচলিত ধারা প্রভৃতি এসব জিনিসও রয়েছে, তারা নিজেরা যথেষ্ট সৎ হলেও তাদের মধ্যে এমন অনেক কিছুই থাকতে পাবে যা সমুচিত রকমের চৈত্য জীবনের পরিপন্থী। তারপবে সেই সব পিতামাতা তাদের সন্তানদের যতই ভাল রকমেব শিক্ষা দিতে চেষ্টা করুক, তথাপি বাইরের আরো নানা রকম লোকের সংস্পর্শে ওদের নিত্যই আসতে হয়, আর প্রথম কচি বয়সে সেই সকল মানুষের প্রভাব তাদের মধ্যে অনেকটাই কাজ করে। অবচেতনের মধ্যে তার থেকে যে সব দাগ পড়ে সেগুলিকে মুছে ফেলতেও পরে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়।

তাই বলছিলাম, এখনকার কালে আপন আপন দেহাধারের মধ্যে তোমাদের এইভাবে গড়ে উঠতে হয়েছে

বলেই তোমাদের এত অসংখ্য রকমের বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ; সেগুলি অবচেতনের মধ্যে জমা হয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে সেখান থেকে বাইরে ভেসে ওঠে ; স্বাভাবিক উপায়ে অগ্রগতির পথে চলতে হলে এবং ঐগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে তোমাদের তার বিরুদ্ধে খানিকটা সংগ্রাম করতেই হবে।

দেহ সম্পর্কে

দৈহিক অবসাদ আসে ভিতরের সঙ্গতির অভাব থেকে। আপাতদৃষ্টিতে তার অন্যান্য যত রকমেরই কারণ থাক, তা শেষ পর্যন্ত ঐ মূল কারণটিতে গিয়েই ঠেকবে, অর্থাৎ সত্তার বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে গরমিল ও অসঙ্গতি। মনে কর তুমি হয়তো একদিন দেখলে যে প্রথমটায় কাজে যথেষ্টই উৎসাহ ছিল কিন্তু সে উৎসাহের অনেকখানি খরচ হয়ে যাবার পর থেকে তোমার ক্লান্তি আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের বেলাতে এমন ধরনের ক্লান্তি কখনো হয় না। তারা যতক্ষণ পারে ততক্ষণ কেবল খরচই করতে থাকে, তারপর শেষ মুহূর্তে যখন আর তা না পারে তখন একেবারেই ঘুমিয়ে পড়ে। হয়তো এক মিনিট আগেই দেখেছ যে তারা ছুটছে, চেঁচাচ্ছে, লাফা-লাফি করছে, তার পরের মুহূর্তেই দেখলে যে একেবারে শুয়ে পড়ল এবং তখনই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। আর এই করতে করতেই তারা বেড়ে ওঠে আর দেহেও তাদের শক্তি বাড়ে। সুতরাং খরচ করলেই যে অবসাদ আসে তা নয়, যা খরচ হয় তা বিশ্রাম নিলেই পুষিয়ে যায়। বস্তুতঃ অবসাদ আর আলস্য আসে অন্য কারণ থেকে।

লোকে মনে করে যে প্রত্যহের কাজগুলি যথারীতি করে যেতে পারলেই হল, তাহলে একই চেতনা নিয়ে একই রকমে সব জিনিস করা হতে থাকবে, তাতেই ভিতরকার ব্যাপার সব ঠিক ঠিক বজায় থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সেই নিয়মিত কার্যধারার মধ্যেও তোমার সত্তার কোন একটি অংশ

তোমার নিজের অজ্ঞাতে হঠাৎ খানিকটা দূর এগিয়ে চলে যায়—হয়তো কোন অনুভূতি পেয়ে কিংবা চিন্তাধারার দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটা নতুন কিছু সে আবিষ্কার করে, একটা নতুন আলোর সন্ধান বা উচ্চতর প্রেরণা তার মিলে যায়। সেই নবচেতনাপ্রাপ্ত অংশ তখন অন্য সব অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরোত্তর আরো এগিয়ে এগিয়ে চলে, আর বাকি সব অংশগুলি থেকে যায় তার পিছনে পড়ে। এর থেকেই জন্মায় নিজের সত্তার মধ্যে অসঙ্গতি, আর তার থেকেই আসে অবসাদ, এমন কি চূড়ান্ত অবসাদ আসবার পক্ষেও তাই যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এ ঠিক অবসাদও নয়, এ হল স্থির হয়ে থেমে যেতে চাওয়া, নিজের ভিতর ঢুকে একাগ্রতা এনে অমিল অংশগুলির মধ্যে একটা নতুন সঙ্গতির অবস্থা এনে ফেলবার চেষ্টা। খানিক সময়ের জন্য এই ভাবে থাকা তখন দরকার হয়, নতুন যা শিক্ষা হল তার থেকে ঐ সময়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যায়, পারতপক্ষে নিজের সকল বিভাগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এনে ফেলা যায়।

আপন দেহসত্তার ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে মানুষ খুবই অজ্ঞান। তোমাদের মধ্যে ক'জন জান যে নিজের দেহের পক্ষে কতটা খাদ্যের আর কোন প্রকার খাদ্যের দরকার? উচিত হিসাবে কতটা খেতে হবে আর কখন খেতে হবে এটুকুও কেউ কি জান? তা জান না তোমরা। অথচ অনেক বিষয়েই তোমরা অনেক শিখেছ। তোমরা শিখেছ যে পৃথিবী কেন ঘোরে আর সূর্য কেন ঘোরে না, দুটি সমকোণ থাকলে কেমন করে একটি ত্রিভুজ হয়: তোমাদের কল্পনাশক্তি আর বুদ্ধি ঐ সব দিক

দিয়েই ধারাল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সামান্য জ্ঞানটি তোমাদের হয়নি—কতটা খাওয়া আর কোন সময়ে খাওয়া দেহের জন্য দরকার। অবশ্য কখনই যে সেই দরকারের কথাটা তোমরা জানতে পার না তা নয়। কিন্তু সমুচিতভাবে জানা মানেই তাকে একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড় করান, যা করতে হয়তো অনেক বছরের পরিশ্রম লেগে যাবে। তেমনি আবার মনকে নিজের বশে আনতেও অনেক বছর সময় লেগে যায়। যদি এমন সূক্ষ্ম চেতনা পেতে চাও যা রূপান্তর ও উন্নতির উপায়গুলির সঙ্গে তোমার সংস্পর্শ ঘটিয়ে দেবে, যদি জানতে চাও যে কতটা প্রচেষ্টা ও সক্রিয়তা তোমার দেহের দ্বারা চলতে পারবে, কতটা এনার্জি তুমি নিতে আর খরচ করতে পারবে, এবং তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে পারবে, যদি জানতে চাও যে সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হলে তাতে দেহস্থ যে কোষগুলি পিছিয়ে পড়ল তাদের উদ্বুদ্ধ করে আবার নতুন সামঞ্জস্য এনে ফেলার জন্য কেমনভাবে সেই এনার্জিকে কাজে লাগাতে পারবে, এবং তারও পরে আবার উন্নতির পথে নতুন করে এগোবার জন্য অনুকূল অবস্থা গড়ে তুলতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি—এ নিতান্ত সহজ কাজ নয়। অথচ রূপান্তর আনতে চাইলে এই সব কিছুই করা দরকার। প্রথমতঃ তোমার আভ্যন্তরীণ চেতনার সঙ্গে দেহাংশের একটা পূর্ণ সঙ্গতি আনা চাই। তার মানে দেহের প্রত্যেকটি কোষের দিকে, তার প্রত্যেকটি ছোট বড় ক্রিয়ার দিকে, দেহস্থ যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি গতিবিধির দিকে তোমায় মনোযোগ দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কাজ নেই, এই নিয়েই সর্বক্ষণ লেগে থাকতে হবে। সে প্রয়াস, সে একাগ্রতা, সে

আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি সব সময় সমানে বজায় রাখা নিতান্ত সহজ কথা নয়।

যে রূপান্তরকারী শক্তি তোমার মধ্যে অবতরণ করে কাজ করতে চাইছে, তার কাজে সম্যকভাবে সাড়া দিতে ও সহায়তা করতে হলে তোমার নিজের আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের মধ্যে ক্ষুদ্রতম কোষগুলির ভিতরে পর্যন্ত গিয়ে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে প্রথমতঃ তোমার জানা চাই যে সেই সব ভিন্ন ভিন্ন কোষের গুচ্ছগুলি কেমনভাবে রয়েছে, কেমন প্রকারে তারা আপন আপন কাজগুলি করে যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের তরফে গ্রহণযোগ্যতা আছে কতখানি, কোনগুলি উপযুক্ত অবস্থাতে রয়েছে আর কোনগুলি তেমন উপযুক্ত নয়। অথচ এদিকে তোমরা এই সামান্য খবরটাই জান না যে সত্যই তোমার অবসাদ এসেছে কিনা, কেন অবসাদ এল তা জানা তো দূরের কথা। এটুকুও তোমরা বুঝতে পার না যে কোন জায়গাটিতে ব্যথা করছে আর কিসের জন্য ব্যথা হচ্ছে। এ কথা জানবার জন্য তোমাদের ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়। কারণ তোমাদের একটা ধারণা রয়েছে যে ডাক্তারকে দেখালেই সে বলে দিতে পারবে তোমার দেহের মধ্যে কোথায় কোন জিনিস কেমনভাবে রয়েছে আর কোথায় কি ব্যাপার হচ্ছে। যদিও এমন মনে করা খুব যুক্তিসঙ্গত হয় না, কিন্তু সকলে তোমরা তাই মনে করতেই অভ্যস্ত। অপরপক্ষে কেই-বা নিজের মধ্যে নিখুঁত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে যে দেহের মধ্যে কোন জিনিসটা বিগড়েছে, কেনই-বা তা বিগড়েছে, আর কেমন করেই-বা তা ঘটল? এর জন্য খাঁটি রকমের পূর্ণ

পর্যবেক্ষণ-শক্তির দরকার, সেই শক্তির উৎকর্ষ করলে তবেই তা জানা যেতে পারে। এবং তার পরে আরো কঠিন সমস্যার কথা বাকি রইল যে বাস্তবিক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দবকার যাতে সেই সকল দোষকে ঘুচিয়ে দিয়ে নিজেকে নূতন অবস্থার উপযোগী করা যেতে পারে। কিন্তু এতটা পর্যন্ত হল রূপান্তর সম্পর্কীয় প্রথম বর্ণপরিচয়ের ক-খ চেনা মাত্র।

দেহের দ্বারা সাধনা চাই

অনেকে জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে ওঠে। বর্তমান জীবনকে তারা ত্যাগ করতেই ইচ্ছা করে, এই আশায় যে পরের বারে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জীবন মিলবে। কিন্তু আমরা বলি : যে দেহটি এখন পেয়েছ তাকে ছেড়ে পালিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই, দেহ থেকে বেরিয়ে তারপর যে অবস্থায় গিয়ে পড়বে তা খুব আরামের হবে না। বরং সে আরো বেশি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই দেহটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে যোগের জন্য। পার্থিব জীবন নিয়ে আমরা যতকালের জন্য এই পৃথিবীতে এসে রয়েছি সেই সময়টুকুব মধ্যেই নিজেদের যা কিছু উন্নতি করে নিতে পারব।

পার্থিব জীবনের বাইরে গিয়ে উন্নতির কাজ কিছুই করা যায় না। কেবল এই ঐহিক জীবন, এই ভৌতিক জীবনই হল অগ্রগতির জীবন। এখানে এসে জন্ম নিয়েই আমরা যা কিছু পরিমাণে বেড়ে উঠতে পারি, বিবর্তনেব পথে অগ্রসর হতে পারি। এ জীবন ছেড়ে গেলেই তখন চুপ করে থেমে থাকা, না হয় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা। এখান থেকে ছেড়ে অন্যত্র যে অবস্থায় গিয়ে পড়ব তা হবে নিজেদের ক্রিয়াগুলিকে জীর্ণ করবার কিংবা বিশ্রাম নেবার কিংবা অচল থাকবার অবস্থা। আবাব চলার অবস্থায় বা উন্নতিযাত্রার অবস্থায় ফিরতে হলে তোমাকে এই পৃথিবীতেই কোন দেহাধারের মধ্যে জন্ম নিতে হবে।

সুতরাং যতক্ষণ তুমি দেহধারণ করে আছ ততক্ষণই তোমার

উন্নতিব রাস্তা খোলা রয়েছে, যেমনি দেহটি ত্যাগ করবে অমনি সে বাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন, আসল উন্নতি মানেই সাধনা, কেবল সাধনার দ্বারাই অতিশয় চেতনভাবে অতিশয় তাড়াতাড়ি উন্নতির কাজ করে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করতে থাকলে তাতেও ক্রমিক উন্নতি হতে থাকে বটে, কিন্তু তাতে জিনিসটা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিলম্বিত হয়, এক পা মাত্র এগোতে শত শতাব্দী সময় লেগে যায়।

সাধনার দ্বারাই হয় যথার্থ উন্নতি। যোগের সাহায্যে তুমি একটু সময়ের মধ্যে যতখানি করে ফেলতে পার, মামুলী-ভাবে ততখানি কবতে তোমার অফুরন্ত দীর্ঘকাল সময় লেগে যাবে। কিন্তু তাও এই পৃথিবীতে এই দেহের মধ্যে থেকেই করতে পার, তা ছাড়া অন্যত্র নয়। তাই বলছি, যতক্ষণ এই দেহের মধ্যে রয়েছ ততক্ষণ এর সুযোগটুকু পুরোপুরি ভাবেই নিয়ে নাও, সময় একটুও নষ্ট ক'র না, "পরে হবে, পরে করব" বলে বসে থেক না। যা করবার তা এখনই কর। উন্নতির পথে না চলে যে ক'টা বছর কাটাবে তা বৃথা নষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য পরে শুধু আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

* * *

এখানকার পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে, সে যেই হোক আর যেমনই হোক, আর যদিও প্রত্যেকেই রয়েছে বিবর্তনের পথের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধাপে, তবুও সকলেরই মধ্যে আছে একটি চৈত্যসত্তা বা চৈত্যপুরুষ। তা ছাড়াও দেহধারী

মানুষের মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে, যেমন চেতনার বিভিন্ন প্রকৃতি ও আকৃতি। পৃথিবীতে এসে প্রত্যেকের কাজ হল এই যে, সমূহ বিশ্বের যেটুকু অংশ আর যেটুকু উপাদান তার মধ্যে জুগিয়ে দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করে তোলার ভার দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে পরিণত অবস্থায় রূপান্তরিত করতে সফল হওয়া। এ যদিও শুধু নিজেরই উন্নতির কাজ আর এ ছাড়া তার যদি আরো বেশি কোন বড় রকমের কাজ করবার থাকে, তবু আগে নিজের দিকের কাজটি শেষ না করে সে তেমন কোন বৃহত্তর কাজ করতে পারবে না। আগে তুমি নিজেকে বদলাও, নইলে জগৎকে বদলাতে পার না। এটিই হল সর্বপ্রথম অপরিহার্য করণীয়, ছেলে বুড়ো কিংবা ছোট বড় সকলের বেলাতেই। এই কারণেই তোমার চৈত্য-পুরুষকে জীবনকালের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে: মানুষের পক্ষে তার জীবনকালটি কেবল উন্নতি করবারই সুযোগ দেওয়া। যতদিন তোমার পার্থিব জীবনের মেয়াদ রয়েছে ততদিনই উন্নতি করবার সময় হাতে রয়েছে। জীবন যেমন ফুরিয়ে গেল অমনি উন্নতির কাজ থেমে গেল। কেবল এই জীবনের মধ্যেই রয়েছে উন্নতির উপায় এবং তার সম্ভাবনা। সুতরাং আগে তোমার নিজেকে নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে। সে কাজটি আগে শেষ করে তার পরে অন্য কোন কাজ শুরু করতে পার। কিন্তু প্রথম কাজ নিজের দিক দিয়ে।

যে ব্যক্তি কাপুরুষ সেই নিজেকে নষ্ট করতে চায়। তোমার ভিতরকার চৈত্যপুরুষ এখানে এসেছে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, কিছু অভিজ্ঞতা পেতে, শিক্ষা পেতে, উন্নতি করে নিতে।

সে কাজ শেষ না করেই যদি চলে যাও, তাহলে আবার ফিরে এসে তাই করতে হবে, কিন্তু তখনকার কাজ এখনকার চেয়ে আরো অনেক বেশি কঠিন হবে। বর্তমান জীবনে তুমি যা কিছুই এড়াতে চেয়েছ, পরবর্তী জীবনে সেগুলি আরো কঠিন আকারে দেখা দেবে। এ কথা বোঝবার জন্য বেশিদূর পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, তোমার এখনকার জীবনের অতি সামান্য বিপদ এই পরীক্ষা পাশ করার কথাটাই ভেবে দেখ। উপস্থিত পরীক্ষাটি না দিয়ে যদি এ-বিপদকে এবার এড়িয়ে যাও, তবে এর পরের বারেও সে পরীক্ষা পাশ করতেই হবে, আর সে কাজ তোমার পক্ষে তখন আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠবে।

কিন্তু মানুষ এমনই অজ্ঞান। তারা ভাবে যে জীবন ও মরণ এই দুটির মধ্যে জীবনেই যত কিছু দুঃখকষ্টের হাঙ্গামা, মরণে সব শান্তি। তা মোটেই নয়। অজ্ঞানতায় ও অন্ধ আবেগে কেউ যখন অস্বাভাবিক উপায়ে দেহত্যাগ করে, তখন তাকে সটান গিয়ে পড়তে হয় এক প্রাণময় জগতে, সেখানেও ঐ অন্ধ আবেগ ও অজ্ঞানতার ক্রিয়া সমানেই চলতে থাকে। যে কষ্টকে সে এড়াতে চেয়েছিল, সেখানে গিয়েও সেগুলি ভোগ করতে হয়, কিন্তু সেখানে দেহের অবলম্বনটি নেই। রাত্রে যখন দুঃস্বপ্ন দেখে খুব ভয় পাও, অর্থাৎ এ-জগৎ ছেড়ে হঠাৎ সেই প্রাণময় জগতে গিয়ে পড়, তখন ঘুম ভাঙলেই সে ভয়টি তোমার কেটে যায়, তার মানে দেহের আশ্রয়ে ফিরে এলে আর সে ভয় থাকে না। কিন্তু যদি তুমি নিজে ইচ্ছা করে এই দেহের আশ্রয়কে নষ্ট করে ফেল, তাহলে এমন নিরাপদের

বর্ম ঘেরা কবচটি হারিয়ে ফেললে। কাজেই তখন সেই দুঃস্বপ্ন অবিরাম চলতে থাকবে। সেটা খুব সুখের কথা নয়।

দুঃস্বপ্নের কষ্ট এড়াবার উপায় হল আপন চৈত্য চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা; যখন তুমি সে চেতনার মধ্যে রয়েছ তখন কোন কিছুই তোমাকে ভয় দেখাতে বা যন্ত্রণা দিতে পারবে না। কেবল যখন অজ্ঞানতার মধ্যে গিয়ে পড় তখনই বিপদের সম্মুখীন হতে সাহস বা শক্তি থাকে না।

কাপুরুষতা আসার কারণ কি?

অজ্ঞানতার কারণেই তা আসে। যত কিছু অনিষ্টের মূল হল অজ্ঞানতা। কিন্তু আমার মনে হয় যে, মানুষ যখন তামসিক ভাব নিয়ে থাকে, অর্থাৎ কোন কিছুর প্রয়াসমাত্র করতে ভয় পায়, তখনই সে কাপুরুষ হয়ে যায়।

খাদ্য সম্বন্ধে

বোধ করি আদিম মানবেরা অনেকটা জন্তুদের শামিল ছিল। তখন তারা বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তির বশেই চালিত হ'ত। খিদে পেলেই যখন তখন অমনি খেয়ে নিত, এ বিষয়ে কোন নিয়মাদি ছিল না। আস্বাদ বৈচিত্র্য ও পছন্দের দিক দিয়ে হয়তো তাদের মধ্যেও খাদ্য সম্বন্ধে কিছু পক্ষপাতিত্ব ছিল, সে খবর আমরা বিশেষ কিছু জানি না ; কিন্তু এটুকু জানি যে স্থূল জান্তব প্রণালীতেই তারা জীবন কাটাত, এখনকার মত সূক্ষ্ম মনের দিকের কাজ বা এমনকি প্রাণের দিকের কাজও খুব কম ছিল।

গোড়ায় জন্তুদের মত নিতান্ত বাস্তব ও স্থূল প্রকৃতির হলেও মানুষ অনেক শতাব্দী বা সহস্রাব্দীর পরে ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে একটু একটু করে অপেক্ষাকৃত মনোধর্মী ও প্রাণধর্মী হয়ে উঠল। তখন সে শিষ্ট হয়ে উঠল, তার বুদ্ধিবৃত্তি বাড়ল, কিন্তু সেই সঙ্গে বৈকল্য ও বিকৃতি আসার সম্ভাবনাটিও বেড়ে গেল। কারণ বুদ্ধিকে দুই ভাবে প্রয়োগ করা যায়। সচেতন ইন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষা ও সংযমের দ্বারা যথোচিতভাবে তার ব্যবহার বুঝে সে বিষয়ে রুচিবোধ ও উৎকর্ষ ও জ্ঞান এনে চেতনার উন্নতি করা এক কথা ; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির প্রতি অযথা আসক্তি বাড়ান, লোভের মাত্রা বাড়ান, খাদ্যবিলাসী ও পেটুকস্বভাব হওয়া, সে হল আলাদা কথা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, আস্বাদের সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা ও গবেষণা নিয়ে থাকলে, ও বিষয়ে তুমি খুব সমঝদার হয়ে উঠতে পার : তাতে কোন জিনিসের সঙ্গে অন্য কোন জিনিসের

আস্বাদের কি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে তোমার নিখুঁত জ্ঞান এসে গেল, আস্বাদের দ্বারাই অনেক জিনিসের দামের পার্থক্য বুঝে নিতে পারলে, তাতে প্রাণের দিক থেকে বিশেষ কিছু উন্নতি না হলেও অন্ততঃ ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধটির সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে যথেষ্টই উন্নতি করলে। এ কোন দোষের কথাই হল না,—কিন্তু যেখানে তুমি লোভে পড়ে অনেক রকম খাদ্যাদি খেতে অভ্যস্ত হলে, সর্বক্ষণ খাবার দিকেই তোমার মন, যেখানে শুধু দেহরক্ষার প্রয়োজনে খাচ্ছ না কিন্তু পেটুকস্বভাব হয়ে কামনার বশে খাচ্ছ, সেখানে দুই রকম খাওয়ার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ এসে গেল।

বস্তুতঃ যারা চেখে দেখবার গুণটি পেয়েছে তারা প্রায়ই পেটুক হয় না। তারা তাদের আস্বাদশক্তির উৎকর্ষ ঘটিয়েছে, ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধটিকে সূক্ষ্ম করে তুলেছে, কিন্তু সেখানে খাবার লোভ নেই। তেমনি যে ব্যক্তি শিল্পী হয়, যেমন মনে কর একজন চিত্রকর, সে তার চোখকে এমনভাবে শিক্ষা দেয় যাতে দেহের সৌন্দর্য সম্বন্ধে অর্থাৎ মানবদেহের গঠন এবং বর্ণ, রেখা এবং ভঙ্গি, বিন্যাস ও ছন্দ সম্বন্ধে সে বিচক্ষণ ও বিচারক হয়ে ওঠে। দেহগত কামনা, লালসার কোন প্রশ্নই সেখানে নেই, কেবল রুচিবোধ ও সৌন্দর্য উপলব্ধির কথা, দেখবার সূক্ষ্মশক্তির কথা, সুন্দর জিনিসকে তারিফ করবার কথা, তাতেই সে মশগুল। সাধারণতঃ যারা খাঁটি শিল্পী হয়, যারা শিল্পবিদ্যাকেই ভালবাসে আর তাই নিয়েই থাকে, যারা জগতে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ায়, লালসার দিকটা তাদের বিশেষ থাকে না। সৌন্দর্যরসের উপভোগ নিয়েই তারা মত্ত, তাদের সকল

ইন্দ্রিয় শুধু সৌন্দর্য দেখা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করার কাজেই নিযুক্ত। যারা কেবল প্রাণেব প্রবৃত্তি ও দেহের কামনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, ওরা তাদের দলে নয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে শিক্ষার দ্বারা সংস্কৃতিলাভ করা, ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে রুচিকে মার্জিত করা, এইগুলিই হল মানুষের স্থূল জান্তব প্রবৃত্তিকে ও প্রাণের কামনা-বাসনার ক্রিয়াকে সংশোধিত ও সম্মার্জিত করবার প্রকৃষ্ট উপায়। জোর করে চেপে দিলে তার সংশোধন হয় না; তার বদলে ওগুলিকে বুদ্ধির বশীভূত করে, জ্ঞানযুক্ত করে, সূক্ষ্ম করে তোলা দরকার। তাতেই তার দোষগুলি নিশ্চয় ঘুচবে। ঐ সকল বৃত্তির সম্যক বিকাশ ঘটান চাই চেতনার স্ফুরণ ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে, যাতে ওর সম্বন্ধে সকল দিক দিয়ে সঙ্গতিবোধ ও যাথার্থ্যবোধ জন্মায়, —এ হল মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনও মানুষ এই ভাবেই করে থাকে; পড়াশোনার দ্বারা, চিন্তাক্রিয়ার দ্বারা, তুলনা ও সমালোচনার দ্বারা তাদের বুদ্ধি প্রখর হয়। তাতেই তাদের মনেরও বিস্তার হয়, মানসিক শিক্ষার অভাবে—যে সব সংকীর্ণমনা মানুষ হয়তো পরস্পরবিরোধী সামান্য কয়েকটা ধারণার উপর নির্ভর করেই জীবন কাটায় তাদের চেয়ে ওদের মন অনেক বেশি উদার ও ব্যাপক হয়। সেই সব সংকীর্ণমনা লোকদের ঐ কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, তারা ভাবে যে জীবনধারণের পক্ষে ওতেই যথেষ্ট, কাজেই মন তাদের ছোট এবং সীমাবদ্ধ হয়েই থেকে যায়। অপরপক্ষে যারা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করেছে, অনেক পড়েছে এবং অনেক ভেবেছে, তারা

নিজেদের ধারণার পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়ে সকলেরই ধারণা ও চিন্তার গতি বুঝতে ও তুলনা করে দেখতে পারে,—তারা অনায়াসেই দেখে যে বাঁধাধরা কয়েকটি ধারণাকে জোর করে আঁকড়ে থাকা এবং তাকেই সত্যের একমাত্র ব্যাখ্যা বলে ধার্য করে নেওয়া কতখানি মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা।

রুচির দিক দিয়ে এমন সংস্কৃতি, ইন্দ্রিয়বোধের দিক দিয়ে এমন শিক্ষা, এর প্রয়োজন আছে কারণ চেতনার উচ্চতর স্ফুরণের পক্ষে এতে খুব সাহায্য করে। এমন মানুষ আছে যারা খুবই সরল প্রকৃতির কিন্তু মোটাবুদ্ধি। তীব্র রকমের আবেগ ও প্রেরণার জোরে তারা তাড়াতাড়ি অনেকখানি আধ্যাত্মিক উন্নতি করে ফেলতে পারে, কিন্তু ভিত্তিটা থেকে যায় অপরিণত; উচ্চ অনুভূতির স্তর থেকে সাধারণ চেতনার স্তরে ফিরে এলেই তাদের সঙ্কটে পড়তে হয়, কারণ তখন আর সে অনুভূতি নেই, আছে কেবল সাধারণ প্রাণচেতনা ও দেহচেতনা, তার মধ্যে এমন কোন প্রস্তুতি হয়নি যাতে উচ্চতর শক্তি সেখানে স্থায়ীভাবে নেমে আসতে চাইলে তাকে গ্রহণ করতে ও স্থান দিতে পারবে।

উপবাসের দ্বারা কি ভাবে গ্রহণযোগ্যতা আসতে পারে?

সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রাণ তো রয়েছে দেহকেই কেন্দ্র করে। সেই দেহকে রীতিমত খাদ্য দিতে হয়, তার থেকেই সে শক্তি ও তেজ পায় এবং প্রাণেও তেজ আসে—এই হল দেহ-প্রাণে শক্তি বজায় রাখার একটি উপায়। বর্তমানে একে বলা যেতে পারে একমাত্র উপায় বা অন্ততপক্ষে প্রধানতম উপায়, যদিও এটি তামসিক ধরনের উপায়।

একটু ভাল করে ভেবে দেখলে সহজেই বুঝবে যে বাইরের জিনিস থেকে নিত্য সংগ্রহ করে নেওয়া এই প্রাণের তেজ বা প্রাণশক্তি উদ্ভিদের মধ্যেও আছে আর জন্তুদের মধ্যেও আছে, সুতরাং তুলনা বিচারে বলতে হবে যে ওদের সকলের চেয়ে উচ্চ-শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে ঐভাবে সংগৃহীত প্রাণশক্তি অপেক্ষাকৃত নীচুদরের জিনিস। ওর মধ্যে অবচেতনার উপাদান মিশে আছে, কতকগুলি জড়জাতীয় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করলে তার সঙ্গে সেই জিনিসও অনেকখানি চলে আসবে, তাকে বাদ দেবার কোন উপায় নেই। ওরই গুরুভার তোমাকে অনেকখানি ভারি ও নিরেট করে তোলে, এটা অপরিহার্য। যদি তুমি যথেষ্ট পরিমাণে খাও, তাহলে অতটা জিনিসকে হজম করে নেবার জন্য তোমার অধিকাংশ চেতনাকে সেই কাজে অনেক সময় নিযুক্ত থাকতে হয়। আর যদি তুমি আদৌ কিছু না খেয়ে উপবাস কর, তাতে তুমি অচেতনার স্থূল গুরুভার বহন করা থেকে নিষ্কৃতি পেলে, হজম করা ও খাদ্যকে আত্মগত করে নেওয়ার পরিশ্রমে তোমাকে লিপ্ত থাকতে হল না: এতে তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি মুক্ত হতে পারল। তার পর সে শক্তি খরচ হয়ে গেলে তবুও যদি নিম্নদিক থেকে অর্থাৎ খাদ্যাদি থেকে সে শক্তি সংগ্রহ করে না নাও, তাহলে আপন স্বাভাবিক প্রকৃতির তাগিদে আপনা হতেই চেষ্টা আসতে থাকবে যাতে মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণভাণ্ডার থেকে সেই প্রয়োজনীয় শক্তিকে সরাসরি টেনে নিতে পার। এমন অবস্থাতে কিছু না খেয়ে তোমার মধ্যে অফুরন্ত শক্তি চলে আসতে পারে।

এ তো কেবল পাকস্থলীর ক্রিয়া নয়, যার কাজ হল শুধু

খানিকটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যকেই হজম করা, আর তার থেকেও নিজে আলাদাভাবে তুমি সামান্যমাত্রই শক্তি নিয়ে কাজে লাগাতে পার। কারণ সেই খাদ্যকে চিবানো, তাকে গলাধঃকরণ করা, হজম করা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে গিয়েই তোমার অনেকটা শক্তি খরচ হয়ে যাবে, তার পরে কতটুকুই-বা উদ্বৃত্ত থাকবে? কিন্তু অন্যভাবে যদি নিজস্ব প্রকৃতির সাহায্যে তুমি শক্তির মুক্ত বিশ্বভাণ্ডার থেকে যথাইচ্ছা শক্তি টেনে নেবার কৌশলটি শিখতে পার, তাহলে যতটা নেওয়া তোমার পক্ষে সাধ্য ততটাই তুমি ওর থেকে পেতে পারবে।

তাই বলছিলাম, নিম্নতর উপায়ে খাদ্য থেকে যখন কিছুই তুমি নিচ্ছ না, সেই অবস্থাতে দেহ তার নিজের তাগিদেই অন্য দিক থেকে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করবে। কখনো তা যদি সে প্রচুর পরিমাণে পেয়ে যায়, তার ফলে তোমার মধ্যে জন্মাবে যথেষ্ট তেজ এবং উৎসাহ। তবে দেহ যদি তোমার এমন শক্ত হয় যে কিছুকাল পর্যন্ত অনায়াসে তুমি উপবাসে কাটিয়ে দিতে পার, তাহলে নিজে সক্ষম থেকে তুমি সেই উপার্জিত শক্তিকে সকল প্রকারেই কাজে লাগাতে পারবে—যেমন আভ্যন্তরীণ উন্নতি এনে ফেলা, আপন চেতনাকে বাড়ানো, আপন প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করা। কিন্তু দেহের যদি তেমন সঞ্চয় না থাকে আর উপবাসে সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে যতটুকু তার নেবার ক্ষমতা আর যতটা তুমি টেনে আনতে চাইছ এই দুইএর মধ্যে একটা দারুণ অসঙ্গতি বেধে গিয়ে তোমাকে তখন বিপর্যস্ত করে ফেলবে। তখন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারবে না, শক্তির সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলবে, আর সে অবস্থাতে যে-কোন

বিপদই ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া তেমন অবস্থাতে মানুষ আত্মসংযম হারায়, হয়তো অস্বাভাবিক রকমে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর মনে করতে থাকে এই বুঝি চেতনার খুব একটা উচ্চতর অবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আভ্যন্তরীণ বিকৃতি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অপরপক্ষে সেই অবস্থাতে স্বাভাবিক থাকতে পারলে মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি আরো সূক্ষ্ম ও প্রখর হয়ে ওঠে। তাই যে ব্যক্তি উপবাসে থেকে নীচের দিকের খাদ্যাদি হতে শক্তি কিছু না পেয়েও ঠিক আছে, সে সামান্য একটি ফুল শুঁকেও তার থেকে পুষ্টি কিছু সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে, ঐ ফুলের গন্ধটুকুই তখন সেখানে খাদ্যের কাজ করে, তাব থেকেই সে শক্তি পেয়ে যায়। তবে উপবাসে থেকে না দেখলে এ-জিনিস বোঝা যায় না।

ঐ অবস্থাতে বাস্তবিকই কতকগুলি ক্ষমতা মানুষের প্রখর হয়ে ওঠে, আর তাকেই মনে করা হয় আধ্যাত্মিক শক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুবই কম। তত্রাচ, খাবার চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিয়ে, কোথায় কি পাব এবং কি খাব এ-সকল কথা একেবারেই না ভেবে তুমি উপবাসে থেকে চেতনার কিছু উচ্চস্তরে উঠতে যদি সক্ষম হও, সে তো ভাল কথাই। যদি তোমার এমন বিশ্বাস থাকে যে ওতে তোমাকে বিশুদ্ধ করবে, খানিকটা উপরের দিকেও নিয়ে যেতে পারবে, তাহলে তার ফল ভালই হবে। সেদিক থেকে দেখলে ও কিছু মন্দ কথা নয়: ওতে তোমার দেহকে রোগা করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু অনিষ্ট করবে না। কিন্তু উপবাস করার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত যদি ওর সম্বন্ধেই ভাবতে

থাক, যেমন, উপবাস না করলে কত জিনিস খেতে পারতে বা উপবাস ভেঙে গেলে কত জিনিস খাবে,—তাহলে এমন উপবাস করা হবে গুরুভোজনের চেয়েও বেশি অন্যায়।

বিখ্যাত মেটারলিঙ্ক, যিনি "ব্লু বার্ড"-এর লেখক, তিনি অস্বাভাবিক রকমে মোটা ছিলেন। সূক্ষ্মবোধহেতু এই স্থূলতা তিনি পছন্দ করতেন না, তাই রোগা হবার উদ্দেশ্যে সপ্তাহে একদিন নিয়মিত উপবাস দিতেন। সেদিনটি তিনি খাবার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন। এতে তাঁর বেশ উপকার হয়েছিল।

মোটের উপর সার কথা হল এই: খাওয়া নিয়ে চিন্তা করবে না: জীবনের ব্যবস্থা এমন করে নেবে যাতে ও কাজটি আপনিই হয়ে যায়, তার জন্য ভাবতে না হয়। ঠিক নির্দিষ্ট সময়টিতে খাবে—আর সংযত হয়ে ধীরে সুস্থে বুদ্ধিপূর্বক খাবে। কখনই বেশি খাবে না, কারণ তাতে আবার হজম করার সম্বন্ধে ভাবনা এসে যাবে; তাতে অস্বস্তিও হয় আর সময়ও নষ্ট হয়। যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই খাবে। ও বিষয়ে লোভ ও কামনা, প্রাণের দিকের বাসনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করবে। দেহের প্রয়োজন বুঝেই যদি খাও, তাহলে দেহই তোমাকে বলে দেবে ঠিক কতখানি তাব দরকার। কিন্তু তার বদলে যদি মনের ধারণা কিংবা প্রাণের বাসনাকেই মেনে চল, যেমন কোন জিনিসেব প্রতি লোভ আছে বলে সেই খাদ্যই খেতে চাইলে, সেখানে তুমি দবকারেব চেয়ে অনেক বেশি খেয়ে দেহকে কষ্ট দিতে থাকবে, আর তাতে তোমার স্বাভাবিক বোধশক্তিটুকু নষ্ট হয়ে যাবে।

মাংস খেলে কি হয়?

তাহলে আগে একটা গল্প বলি শোন। সুইডেনের এক তরুণী মেয়ের কথা আমি জানি, সে তখন কিছু সাধনা করত। সে ছিল নিরামিষাশী, স্বভাবেও তাই আর অভ্যাসেও তাই। একদিন কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়াতে সেখানে তাকে মুরগীর মাংস খেতে দেওয়া হয়। ঐ নিয়ে লোক জানাজানি করতে তার সংকোচ হল, কোনগতিকে সে তাই খেয়ে নিলে। তার পর রাত্রে ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখলে যেন তাকে এক টুকবির মধ্যে ভরা হয়েছে, মাথাটা তার লাঠি দিয়ে বাঁধা হয়ে নীচের দিকে ঝুলছে, পা দুটো উপর দিকে ধরে তাকে খুব ঝাঁকানি দিতে দিতে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে কষ্ট খুবই হচ্ছিল। তার পর হঠাৎ দেখলে যে তার গায়ের চামড়াটা টেনে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। তাতে আরো অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকল। তখন কে একজন ছুরি চালিয়ে তার গলাটা কাটতে শুরু করলে। এর পরেই ছট্‌ফট্‌ করে তার ঘুম ভেঙে গেল। গল্পটি শুনিয়ে সে আমাকে বললে যে এমন দারুণ দুঃস্বপ্ন সে জীবনে কখনো দেখেনি। অথচ শুতে যাবার আগে এ-ধরনের কোন কথাই সে কল্পনা করেনি। সেই মৃত মুরগীর চেতনাটাই স্বপ্নের মধ্যে এসে ওকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে তাকে যখন ঐভাবে ঝুলিয়ে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন তার কেমন কষ্ট হয়েছিল, যখন পালক ছাড়িয়ে ফেলা হয় তখনই-বা কেমন কষ্ট হয়েছিল, আর যখন গলা কেটে দেওয়া হয় তখনই-বা কেমন হয়েছিল। বস্তুতঃ এমন হতে পারে। যে মৃত জন্তুটির মাংস তুমি খাও

তার চেতনাটিও মাংসের সঙ্গে অল্পবিস্তর মাত্রায় তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

অবশ্য এতে অনিষ্টের কিছু নেই, কিন্তু সব সময়ে তা সুখের অবস্থা নাও হতে পারে। যদিও এখানে তুমি জন্তুদের তরফের কথাটা ভাববে না, মানুষের তরফের কথাটাই ভাববে। মানুষ খেয়েই থাকে জন্তুদের মাংস, আদিম কালের লোকেরা যখন জন্তুদের শামিল ছিল তখন তারা কাঁচাই খেত, রাঁধা মাংসের চেয়ে তাতে আরো বেশি শক্তিলাভ করত। জন্তুজানোয়ার মেরে এমনি কাঁচা মাংসটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে তাতেই তারা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠত। সেই কারণে হয়তো তাদের অ্যাপেনডিক্স নামক অন্ত্রাংশটি এখনকার চেয়ে খুব বড় ছিল : যেহেতু কাঁচা মাংসগুলোও হজম করতে হ'ত। তার পর যখন তারা আগুনের সাহায্যে রেঁধে খেতে শুরু করল আর দেখল যে তাতে খাদ্যের আস্বাদ বাড়ে, তখন থেকে ক্রমে ক্রমে ঐ অন্ত্রাংশটির ব্যবহার বন্ধ হওয়াতে তা গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে; এখন আর ওটির দ্বারা কোন কাজ হয় না, বরং ওর দ্বারা রোগই জন্মায়। তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমাদের খাদ্যেরও পরিবর্তন করা দরকার, জন্তুদের মত খাদ্যগুলি খাওয়া বদলে ফেলা দরকার। অবশ্য এটি নির্ভর করছে প্রত্যেকের আপন আপন চেতনার অবস্থার উপর। একজন সাধারণ মানুষ, যে সাধারণভাবে জীবনযাপন করে আর সাধারণ রকমের আস্পৃহা নিয়ে থাকে, নিজের রোজগার আর সংসার পালন আর স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়া অন্য কোন কথাই ভাবে না, তার পক্ষে কোন বাছবিচারের দরকার নেই, কেবল শরীর রক্ষার দিকটাই সে ভাববে। তাতে

উপকার পেলে সে মাংসও খেতে পারবে আর সব কিছুই খেতে পারবে।

কিন্তু তুমি সাধারণ জীবন থেকে যদি উচ্চতর জীবনে যেতে চাও, তখন এ প্রশ্ন অন্যরূপ হয়ে দাঁড়াবে। যদি তার চেয়ে আরো উঁচুদিকে যেতে চাও, যদি রূপান্তর আনতে চাও, তখন এ-প্রশ্নের গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে যাবে। কারণ সে অবস্থার দিক দিয়ে খাদ্যের মধ্যে অনেক তারতম্য রয়েছে, কতকগুলি খাদ্য দেহকে সূক্ষ্মস্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আর অন্য কতকগুলি খাদ্য তাকে জন্তুদের স্তরেই রেখে দেয়। কিন্তু এমন তারতম্য কেবল উচ্চ অবস্থারই পক্ষে, তার আগেকার অবস্থার পক্ষে নয়। যতদিন তুমি এ-অবস্থা থেকে সে-অবস্থাতে গিয়ে না পৌছাচ্ছ ততদিন তোমার আরো অনেক জিনিস করবার রয়েছে। আগে তোমার মনকে শুদ্ধ করতে হবে, প্রাণকে শুদ্ধ করতে হবে, দেহশুদ্ধির কথা আসবে তার পরে। আগেই যদি তুমি দেহশুদ্ধির মতলবে সেই দিকেই ঝোঁক দাও, খাদ্য সম্বন্ধে গোঁড়ামি করে সেই প্রকারের খাদ্যই খেতে থাক, অথচ এদিকে মন ও প্রাণের মধ্যে কামনা-বাসনা ও অন্ধ অজ্ঞানতা ও নিশ্চেতনার কাজ যথারীতি পুরোমাত্রায় চলতে থাকে, তাহলে কেবল খাদ্যসংযম ও খাদ্য-বাছাই করে কোন কিছুই লাভ হবে না। বরং হয়তো দেহটি তাতে খুব দুর্বল হয়ে পড়বে, আর বাহ্যের সঙ্গে আভ্যন্তরীণের দারুণ বিরোধ এবং অসঙ্গতিতে দেহপাতও হয়ে যেতে পারে।

কাজ শুরু করা চাই প্রথমে ভিতরদিক থেকে। একশ বার তাই আমি বলি, আগে উপরের দিকটা ধর। আগে উপরকে

শুদ্ধ করে নাও, তার পর নীচের কথা। তার মানে এ-নয় যে ততদিন পর্যন্ত দেহের অনিষ্টকারী জিনিসগুলিকেও আগের মত প্রশ্রয় দিয়ে যেতে থাকবে। সে কথা মোটেই নয়। কামনাকে তখন দমন করার দরকার নেই এমন কথা আমি বলছি না। শুধু এইটুকু বলতে চাইছি : আগেই দেহ সম্পর্কে দেবতা হয়ে উঠতে চেও না, যতদিন মন ও প্রাণের দিক থেকে তা হতে না পারছ। তখন ওরকম চেষ্টা করতে গেলে বিপর্যয় বেধে যাবে, কারণ তোমার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যাতে সেটি বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে আমি বরাবরই তোমাদের বলি, উন্নতি করতে হলে সকল অংশগুলিকে একসঙ্গে নিয়েই উন্নতি করবার চেষ্টা চাই। এক অংশের মধ্যে আলো জ্বেলে অন্য অংশকে অন্ধকারে ফেলে রাখা চলবে না। দেখতে হবে যে কোন দিকের কোন কোণেই যেন অন্ধকার থেকে না যায়।

উন্নতি ও আস্থা

সাধনাতে একটু উন্নতি হচ্ছে দেখলেই খুব হয়েছে ভেবে মিথ্যা আত্মতুষ্টি আসাতে অনেকে গর্বিত হয়ে ওঠে, তাতে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। এ-দোষ যাতে না আসে তার উপায় কি?

এ-দোষ আসা সম্ভব, কোন কিছু প্রয়াস করতে করতে কেবল নিজের দিকে নজর থাকার জন্য। যা কিছুই করছ তার মধ্যেই নিজের দিকে সর্বক্ষণ চেয়ে আছ, এ-এক বদ অভ্যাস। অবশ্য নিজেকেও লক্ষ্য করবে বৈকি; কিন্তু তোমার আসল কাজটি হওয়া চাই একাগ্র, স্বতঃস্ফূর্ত—যা করবে তা যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করা হয়, তখন আত্মচেতন হয়ে বারবার নিজের দিকে চাওয়া নেই, নিজেকে পরখ করবে না, বিচার করবে না, এমনকি নিজে খুঁত বের করতেও যাবে না। আত্মশ্লাঘার মতই ওটাও খারাপ জিনিস।

আস্পৃহা তোমার এমনই একাগ্র হওয়া চাই যে, তুমি একটা কিছু বিশেষ আস্পৃহাতে লেগেছ তাও মনে ভাববে না: আস্পৃহাটির সঙ্গে নিজে তুমি একাত্ম হয়ে যাবে। সে অবস্থা যখন হয়ে দাঁড়াবে তখন নিজের মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি বোধ করবে। এক মিনিটের জন্যও সেই অনুভূতি এলে তাতে তোমার অনেক বছরের উন্নতির কাজ হযে যাবে। যখন তোমার "আমি" ভাবটি বড় হয়ে নেই, অর্থাৎ সেই অহংটি নেই যে কেবল নিজের দিকেই চাইতে জানে, যে কাজটি করতে নেমেছ স্বয়ং সেই কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছ—বিশেষ করে আস্পৃহা-

ঘটিত কাজের বেলাতে—তাই হল সব চেয়ে সেরা জিনিস। যেন কেউ একজন মানুষ সেই আস্পৃহা কবছে না, তা আপনা হতে নিজেরই কেন্দ্রীভূত চাপে উৎসারিত হয়ে উঠছে, এমন হলে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারা যায়। নতুবা ওর মধ্যে এসে ঢোকে আত্মদর্প, আত্মপ্রশংসা, এমনকি আত্মদয়া পর্যন্ত. অনেক রকম তুচ্ছ ভেজাল ওর মধ্যে ঢুকে সমস্তকে নষ্ট করে দেয়।

প্রকৃত আস্থা জন্মাতে পারে কেমন ভাবে?

সব চেয়ে বড় জিনিস হল আস্থা, শিশুদের মত সবল ও নিঃসন্দেহ আস্থা, সেই অকৃত্রিম মনোভাব যে আমার প্রার্থিত জিনিস মিলবেই মিলবে, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই নেই। শিশু যা পেতে চায় তা যে নিশ্চয় পাওয়া যাবে এই একটি কথাই সে ভাবতে থাকে। এমনি সোজাসুজি বিশ্বাস বা নির্ভবতা থাকাই সব চেয়ে বেশি দরকার।

আস্পৃহা করতে হবে, এ-তো অপরিহার্য; কিন্তু আস্পৃহার সঙ্গেও অনেকের মধ্যে দারুণ দ্বন্দ্ববিরোধ চলতে থাকে, যেমন বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, আস্থায় ও অনাস্থায়, জয় হবার আশায় ও পতন হবার নিবাশায় নিত্য ওলট-পালট ও দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি। সত্তার মধ্যে যদি এমন দুই দুই ব্যাপার চলতে থাকে তাহলে যতই আস্পৃহা নিয়ে থাক তার সুফল কিছু মিলবে না। তুমি হয়তো বলবে, "এত আস্পৃহা করছি তবু কিছুই তো হল না"; কিন্তু তার কারণটি রয়েছে এই যে প্রকৃত আস্থার অভাবে তুমি নিজেই নিজের আস্পৃহাকে চূর্ণ করে দিচ্ছ। যদি প্রকৃত আস্থা সেখানে থাকে তাহলে তার ফল হবে অন্যবকম। ছোটদের

মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবে যে বড়দের প্রভাবে যদি তাদের মন কিছু বিগড়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে তাদের আপনা থেকেই একটা দৃঢ়প্রত্যয় থাকে যে সবরকম গণ্ডগোলই ঠিক হয়ে যাবে। কোন বিশেষ দুর্ঘটনা হয়ে গেলেও তারা ভাবে না যে ওতে মারাত্মক কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাদের মনে একটা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস থাকে যে শীঘ্রই ওটা সেরে যাবে, আর তাতেই তারা খুব শীঘ্র সেরেও ওঠে।

যখন তুমি উচ্চশক্তি লাভের জন্য আস্পৃহা করবে তখন ভগবানের দিকে ফিরে তাঁর সাহায্য চাইবে, আর যদি তোমার সেই আস্থাটি থাকে যে চাইলে তা নিশ্চয় মেলে, তাহলে সেই প্রার্থিত সাহায্য মিলল না এমন কখনো হতেই পারে না। এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস আসা মানেই সেখানে আভ্যন্তরীণ উন্মীলনটিও এসে গেছে। এমন মানুষ দেখা যায় যাদের আপনা থেকেই এইরকম নিশ্চয়তা এসে যায়। তাই যখনই বা যেখানেই উপর থেকে কিছু নেমে আসবার সম্ভাবনা হয়, তখনই দেখা যায় যে তারাও সেখানে ঠিক সময়ে জুটে গেছে। আবার এমন মানুষও আছে যারা ঐরূপ সম্ভাবনার ক্ষেত্র হলেই নিশ্চয় সেখানে অনুপস্থিত থাকবে: ঠিক আসন্ন সময়টিতেই তারা নিজেদের ঘরের দরজা এঁটে বসে আছে। অথচ যাদের মধ্যে রয়েছে শিশুদের মত সরল নির্ভরতা, তারা কখনই সে সম্ভাবনার সুযোগটুকু পাওয়া থেকে বাদ পড়ে না। এ-এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু এই দুই জাতের মানুষের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য রয়েছে তা নয়। দুজনের মনে একই রকমের শুভ সংকল্প, উভয়ের মধ্যে একই ধরনের আস্পৃহা,

যথাসাধ্য চেষ্টা করতেও একই রকমের আগ্রহ,—কিন্তু যার মনে জেগেছে সরল আশা, যে কোন প্রশ্ন করে না, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মিলবে কিনা কিংবা ভগবান তার আশা সফল করবেন কিনা এ-বিষয় নিয়ে যে চিন্তাই করে না—কারণ সে এটা ধার্য করে নিয়েছে যে নিশ্চয়ই তা মিলবে : তার মন বলছে, "আমার মিলে যাবেই. প্রার্থনা আমার পূরণ হবেই, কষ্টে পড়ে সাহায্য চাইলে তা আমি পাবই আর শুধু তাই নয় তাতে সব দুঃখ আমার ঘুচে যাবে" : এমন প্রকৃতির যে সন্দেহবিহীন সরলবিশ্বাসী নির্ভরশীল মানুষ হবে, তারই মধ্যে উচ্চশক্তির অবতরণ সার্থকভাবে ঘটতে পারে ; সে শক্তির ক্রিয়াও সেখানে হয় অতি আশ্চর্যজনক।

মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয় ঢুকিয়েই তোমরা সব কিছু নষ্ট কর। কোন একটা বিপত্তির মুখে পড়লেই অমনি তোমরা এই সব কথা ভাবতে শুরু কর : "এ-অসম্ভব কথা হয়ে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছতেই পারব না, অবস্থা ক্রমশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হয়তো এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এই প্রকারে, যে শক্তিকে তুমি আসতে আহ্বান করছ, তার এবং তোমার মধ্যে নিজেই একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল খাড়া করে দাও।

আস্থার নিজের থাকার ঘর হল তোমার অন্তরাত্মা, চৈত্য-সত্তা। সেখানে তার কোন ছায়াপাত নেই, সন্দেহ নেই, দ্বিধা দৌর্বল্য নেই, অম্লান হয়ে সেখানে সে অতি আশ্চর্য রকমে বিরাজ করছে ; আর সেখানকার সেই সরল আস্থাকে যদি বিনা বাধায় কাজ করতে দাও তাহলে কোন প্রার্থনাই তোমার বৃথা যাবে না, কোন আস্পৃহাই অপূর্ণ থাকবে না।

ধর্মানুষ্ঠানের ফল

ধর্মানুষ্ঠান (জপ তপ প্রভৃতি) করার ফল কি ?

এই সব ক্রিয়াতে যদি তুমি নিজে কিছু উপকার পাও তাহলে অবশ্যই তার দাম আছে; যদি তা না পাও তাহলে কিন্তু ওর কোন দাম নেই। ওর যা ফল তা ব্যক্তিগত অবস্থা-সাপেক্ষ। তোমার উপর ওর যতখানি প্রভাব এসে পড়ে, কিংবা ওর উপর যতখানি তোমার বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী ওর দাম। যদি ওতে তোমার একাগ্রতা আনবার পক্ষে সাহায্য করে তাহলে ওগুলি করা তোমার পক্ষে ফলপ্রদ হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের চেতনাতে এই সব জিনিসকে একরকম অন্ধ-সংস্কারের ভাব নিয়েই দেখা হয়; যেমন তারা মনে করে, "আমি যদি সপ্তাহে একবার করে মন্দিরে বা গির্জাতে প্রার্থনা করতে যাই, যদি আমি প্রত্যহ নিয়মিত পূজা পাঠ করি, তাহলে আমার কিছু একটা লাভ হবে বা পুণ্য হবে।" এই ধরনের অন্ধসংস্কারই জগতের সর্বত্র ছেয়ে রয়েছে, কিন্তু অমন জিনিসের কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নেই।

আমি বহু তীর্থস্থানে গিয়ে দেখেছি। ফ্রান্সে, জাপানে, এবং আরো অনেক অনেক দেশে বিখ্যাত বড় বড় ধর্মমন্দির দেখে এসেছি; সেই সব মন্দির বা গির্জা এক ধরনের নয় এবং সেখানকার পূজ্য দেবতারাও এক রকমের নয়, কিন্তু এত বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েও আমার মনে যে ভাব জেগেছিল তা অনেকটা একই রকমের, যা অভিজ্ঞতা পেলাম তাও প্রায় একই রকমের,

সামান্য কিছু তফাৎ থাকতে পারে। সাধারণতঃ কোন একটি শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি সম্পূর্ণই নির্ভর করছে বিশ্বাসীদের নিজেদের বিশ্বাসের উপর; কিন্তু বাস্তব যে শক্তি সেখানে প্রাধান্য করছে আর বিশ্বাসীরা তাকে যে ভাবে গ্রহণ করছে, এ দুইএর মধ্যে অনেক তফাৎ। যেমন বলি, কোন একটি নামজাদা তীর্থস্থানে আমি গিয়েছিলাম; শিল্পকার্যের দিক থেকেও সে স্থান অতুলনীয়, তেমন অপরূপ শিল্পসৃষ্টির কথা কল্পনাও করা যায় না; আমি তার ভিতরকার পূজাস্থানে সব চেয়ে পবিত্র জায়গাটিতে গিয়ে দেখি—সেখানে প্রকাণ্ড এক কালো মাকড়সা, চারিদিকের দেয়ালে দেয়ালে সে জাল বুনে রেখেছে, ভক্তদের যত কিছু ভক্তি আর নিবেদন আর পূজা প্রার্থনা সমস্ত ওতেই গিয়ে আটকেছে, ওর জালের মধ্যেই জড়িয়ে আছে। এই দেখে আমি অবশ্য খুব আনন্দ পাইনি। কিন্তু অপরাপর যারা সেখানে পরম ভক্তির সঙ্গে পূজা বা প্রার্থনা করছিল, তারা হয়তো ভগবানের সান্নিধ্য প্রকৃতই বোধ করছিল, এবং তাদের দিক থেকে তাতে যথেষ্টই কাজ হচ্ছিল। তবে আমি যা দেখলাম তা মিথ্যা নয়। কেবল ঐ লোকগুলির বিশ্বাসের জোরেই মন্দ ব্যাপারটাও তাদের কাছে ভাল হয়ে দাঁড়াল। এখন, আমি যদি তাদের কাছে গিয়ে বলতাম: "তোমাদের পূজা কি উপরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে মনে কর! যা কিছু তোমরা পাঠাচ্ছ তা সমস্তই ঐ প্রাণময় প্রকাণ্ড মাকড়সাটা জাল দিয়ে শুষে নিচ্ছে", তাহলে আমার পক্ষে সেটা খুব ভাল কাজ হ'ত না। কিন্তু সর্বত্রই দেখবে এমনি প্রায় একই রকমের ব্যাপার।

প্রাণস্তরের কোন শক্তিই এ-সব জায়গাতে প্রাধান্য করে। মানুষের অন্তরের আবেগের যত স্পন্দনগুলি সেই প্রাণময় শক্তিদেরই খোরাক জোগায়। অতি অল্পসংখ্যক লোকই এমন আছে, অণুবীক্ষণের সাহায্য নিয়ে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, যারা মন্দিরে বা গির্জায় বা তীর্থস্থানে যায় প্রকৃত ধর্মভাব মনে নিয়ে, ভগবানের কাছে কোন কিছু চাইতে নয় কিন্তু নিজেকে নিবেদন করে দিতে, কৃতজ্ঞতা ও আস্পৃহা নিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে। লাখের মধ্যে যদি তেমন একটিও থাকে তো যথেষ্ট। এমন লোক যখন সেখানে যায় তখন সে ঐ সময়টিতে ভগবানের কিছু স্পর্শ পায়। কিন্তু আর সকলে যারা যায় তারা সঙ্গে নিয়ে যায় কেবল তাদের অন্ধসংস্কার, তাদের অহংভাব ও স্বার্থভাব, তাতেই সেখানকার আবহাওয়া অমন বিচিত্র হয়ে ওঠে। যে কোন তীর্থস্থানে যাও সেখানে ঐরকম আবহাওয়াই তুমি গ্রহণ করতে থাক ; তবে তোমার নিজের মধ্যে পবিত্র মনোভাব থাকলে তুমি সেখানে গিয়ে খুশি হও, আর নিজে নিজেই বল, "আহা, কি সুন্দর শান্তির জায়গা !"

খুব দুঃখের সঙ্গেই আমাকে এমন বলতে হচ্ছে, কিন্তু এই হল প্রকৃত সত্য। আমি নিজে তা পরীক্ষা করে দেখেছি। কখন বা অতি দূর সীমান্তে এমন এক স্থানে গিয়ে পড়েছি—এক নগণ্য গ্রামের প্রান্তে সামান্য একটি গির্জাতে—সেখানে গিয়ে কিন্তু মিলে গেছে সত্যিকার শান্তি ও নীরব আস্পৃহার অভ্রান্ত লক্ষণ। তা ছাড়া সর্বত্রই দেখেছি প্রাণময় স্তরের বিরোধী শক্তিরা অমনি জাল বুনে বসে আছে, যা কিছু সেখানে

গিয়ে পড়ছে তার থেকে নিজেদেরই জন্য খাদ্য আদায় করছে। যেখানকার প্রতিষ্ঠান যত বড় সেখানকার এই শোষণকারী শক্তি তত বেশি ভয়ঙ্কর। আর অদৃশ্য জগৎ থেকেও এই প্রাণময় শক্তিরাই চাইছে মানুষের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে। কারণ তাতেই তারা তুষ্ট হয়, তাতেই তাদের গুরুত্ব বাড়ে। ওতে গর্বে ফুলে উঠে তারা মহা আনন্দে থাকে ; বহু মানুষ তাদের আরাধনা নিবেদন করছে, এই তাদের পরম সুখ।

কিন্তু যিনি আসল দেবতা তিনি এ-সব জিনিস চান না। লোকে আমাকে শুধু পূজা করুক এ তাঁর কাম্য নয়, ওতে তাঁর বিশেষ কিছু আনন্দ নেই। তার বদলে কোথাও যদি তিনি দেখেন যে সূক্ষ্ম অনুভবের বোধি ফুটেছে, কোন শুভ মনোভাব জেগেছে, নিঃস্বার্থ ক্রিয়া ও আধ্যাত্মিক অনুরাগ দেখা দিয়েছে, তারই তিনি মূল্য দেন পূজা-প্রার্থনার চেয়ে অনেক বেশি। আমি তোমাদের নিশ্চয় করেই বলছি, প্রকৃতই যিনি দেবতা তাঁকে যদি বল যে আমি তোমাকে পূজা করব, তুমি ঐ চেয়ারের উপর চুপচাপ বসে থাক আর আমার পূজা নিতে থাক, তিনি হয়তো তাতে আমোদবশতঃ রাজিও হতে পারেন, কিন্তু আনন্দ কখনই পাবেন না, এমনকি একটুও না! তোমার পূজা পেয়ে তিনি আপ্যায়িতও হন না, গৌরবান্বিতও হন না, বা পরিতৃপ্তও হন না। ঐ সব ভুল ধারণা মাথার ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দাও। আধ্যাত্মিক জগৎ ও এই জড়জগতের মাঝখানে মস্ত একটা জগৎ রয়েছে, সেখানে প্রাণময় সত্তারাই বসবাস করছে, এ-সব জিনিস সেখানেই গিয়ে পৌঁছয় আর তারাই এগুলি খুব পছন্দ করে,

তাদের খাদ্যই এই। মানুষের কাছ থেকে যখন তারা ডাক শোনে, পূজা পায়, অর্ঘ নিবেদন পায়, তখন নিজেদের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়াতে তারাই ভারি খুশি হয়ে ওঠে; ওদের মধ্যে যার ভক্তের সংখ্যা যত বেশি সে ততই বেশি খুশি, ততই বেশি স্ফীত, গৌরবান্বিত। প্রকৃত দেবতা যিনি হবেন, এমনকি অধিমানস লোকের দেবতারা পর্যন্ত—যদিও তাঁদের মধ্যে মানব দৌর্বল্যের কিছু আঁচ থাকে—তবু উচ্চতর চেতনার অধিকারী হয়ে তাঁরা এইসব তুচ্ছ তোষামোদে তুষ্ট হবেন, এ কেমন করে কল্পনা করা যায়! তাই আবার তোমাদের বলছি, প্রকৃত দরদবোধ ও দয়া, বুদ্ধিমত্তা, নিঃস্বার্থতা, সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বা ঐকান্তিক আস্পৃহা,— এইগুলির দামই ধর্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরের চেয়ে দেবতার কাছে অনেক বেশি হবে, যদি তিনি প্রকৃত দেবতা হন। যেমন মনে কর, এমন এক প্রাণময় সত্তা আছে যাকে কেউ কেউ কালী নাম দিয়ে ডাকে; এমন নানা ধরনের বহু কালী আছেন, তাঁরা স্থান পেয়েছেন নানা মানুষের ঘরে ঘরে এবং মন্দিরে। অধিকাংশই তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রাণস্তরের সত্তা, কোন কোনটি অতি ভয়ঙ্কর। একজনদের সম্বন্ধে আমি জানি, তাদের ছিল এক ঘরোয়া কালী, সেই কালীর ভয়ে তারা সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, পাছে কোন দোষ করে ফেললে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে ওদের প্রতি বিমুখ হন; তাহলেই দারুণ অভিশাপ লাগবে, একটা কিছু সর্বনাশ হবে। এই জাতীয় সত্তাদের খুব ভাল করেই আমি জানি: এরা প্রাণময় জগতের অন্তর্গত—মানুষের মনই এদের নানারকম অদ্ভুত আকৃতি দিয়েছে, আর সে কি সব আকৃতি! কেমন করে তারা সেই ভয়ঙ্করের পূজা করে।

এই সব দেখে বলতে হয় যে আধুনিক মানুষ যে কিছুকালের জন্য এই ধরনের ধর্ম পালনের আবহাওয়া থেকে, আর বিরোধী শক্তিদের পক্ষে অনুকূল এই সব ধর্মভীতি ও সংস্কারের অন্ধ অনুবৃত্তির প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সে বরং ভালই হয়েছিল। ঐ দিক থেকে দেখলে মানুষের এই সব অজ্ঞানতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে আসার জন্য নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতা ও প্রত্যক্ষবাদের একটা যুগ এসে পড়ার দরকার ছিল। তারা যখন প্রাণরাজ্যের এই জাতীয় অশুভ শক্তিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতায় উঠতে সক্ষম হবে, আর তখনই সত্তা ও শক্তি দিব্যচৈতন্যের সঠিক যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তার মঙ্গল কাজের সহায়ক হতে পারবে উপরে উঠতে চাইলে তোমাকে অন্ধসংস্কারের নিম্ন স্তরগুলিকে অনেক নীচে ফেলে আসতে হবে।

আস্পৃহা ও প্রার্থনা

(১)

কাজ যেমন হবে তার ফলও তেমনি হওয়া অনিবার্য—এ-প্রত্যয় বিবর্তনের এক বিশেষ অবস্থাকালে থাকাই দরকার। এতে মানুষকে সম্পূর্ণ একটা অহংবুদ্ধি নিয়ে থাকতে দেয় না, নির্বিচারে নিজের যা খুশি তাই করতে সে বাধা পায়। অনেক মানুষ সাধারণতঃ ঐ রকমের হয়ে থাকে, অধিকাংশই তাই; প্রবৃত্তির বশে তারা যেমন মন যায় তেমনি আচরণ করতে থাকে, একবার ভেবেও দেখে না যে তাতে নিজেদের বা অপরদেব পক্ষে কি ক্ষতি হবে। সুতরাং কেউ যদি তাদের সাবধান করে শুনিয়ে দেয়: "জেনে রেখ, তুমি যে কাজটি এখন করতে যাচ্ছ তার ফল ভোগ করতে হবে বহুকাল পর্যন্ত", তাহলে ওতে তাদের ভালই করা হয়। এমন সব ধর্মমত রয়েছে যাতে লোককে চেতনা দিয়ে বলা হয়েছে: "এখন যা করবে তার ফল ফলবে পরের জন্মে", "অমুক রকমের পাপ কাজ করলে অনন্ত নরক হবে", ইত্যাদি। যদিও এ-সকল মানুষেরই কল্পনাব সৃষ্ট উদ্ভট কথা, কিন্তু তবু এতে ভয় পেয়ে লোকে কতকটা সংযত হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু করে ফেলবার আগে তারা থমকে গিয়ে একটু চিন্তা করে দেখার সময় পায়, যদিও তা সকল ক্ষেত্রে হয় না, কখনো-বা চিন্তাটি আসে বিলম্বে, কাজটি সমাধা হয়ে যাবার পরে।

সকল ধর্মেই যাঁরা বলেছেন যে কর্মের ফল অতি নিখুঁত এবং কঠোর, তাঁরা এ বিষয়ে যে সকল বিধানের সন্ধান দিয়েছেন

আমার মনে হয় সাধারণ মানুষকে ঠিক পথে চালিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেগুলি প্রকৃতির জবানিতেই বলেছেন। সেই সকল বিধান মন থেকে সৃষ্ট হলেও তা আন্তরিক ভাবে বলা, আর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে টুকরো টুকরো করে দেওয়া: "এই কাজটি করবে, ঐ কাজটি কবা চাই; আবার ঐ কাজ ঠিক নয়, এই কাজই ঠিক"। কিন্তু লোকে এত রকমের বিধানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত কোনটা যে উচিত আর কোনটা অনুচিত তা ভেবে পায় না।

তাদেব পক্ষে ঠিক কাজ হবে সব কিছুব উপরে উঠে যাওয়া। আর নিজেদের দরজা খোলবার চাবিটি তাদেবই হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সে চাবি হল—(১) অন্তরের প্রকৃত আস্পৃহা, কিংবা (২) অন্তরের প্রকৃত ব্যাকুল প্রার্থনা। এখানে "কিংবা" কথাটি বললাম, কারণ দুটোই একসঙ্গে না হতে পারে; কারো বা প্রথমটি আসবে কারো বা দ্বিতীয়টি আসবে। কিন্তু দুটোরই ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে, শুধু ঠিকভাবে তার প্রয়োগ করলেই হল।

কেউ কেউ প্রার্থনাকে অপছন্দ কবে। এবা যদি নিজেদের হৃদয়ের গভীরে তলিয়ে দেখে তো দেখতে পাবে সেখানে তার কারণ রয়েছে গর্বভাব, এবং তার চেয়েও যা খারাপ জিনিস, অহমিকা। আবার কারো কারো আস্পৃহা আসে না, তারা চেষ্টা করেও তা আনতে পারে না। পারে না এই কাবণে যে তাদের মধ্যে সংকল্পশক্তির তেমন জোর আগুন জ্বলে ওঠে না, আবার দীন দাস্যভাবের দীপ্তিও সেখানে নেই। অথচ দুটোরই দরকার। কর্মের বাঁধা শৃঙ্খলধারা বদলে ফেলতে হলে দীনভাবও চাই আবার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিও চাই।

ভগবৎ-কৃপাই কর্মের গতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে; সূর্যের আলোতে যেমন মাখন গলিয়ে দেয়, কৃপাতেও তেমনি কর্মকে গলিয়ে দেয়। যদি তোমার মধ্যে ঐকান্তিক আস্পৃহা কিংবা আকুল প্রার্থনা থাকে তাহলে কৃপার জোরে এমন কিছু জিনিস তোমার মধ্যে নেমে আসবে যাতে সব কিছুই বদলে যাবে।

(২)

চেতনার বিভিন্ন স্তরের কথা আমি ইতিপূর্বেই তোমাদের জানিয়েছি। খাঁটি জড়ের স্তরে যা রয়েছে (প্রাণের স্তর থেকে যা স্বতন্ত্র) তার সব কিছুই যন্ত্রবৎ: কার্য-কারণের শিকলের গাঁথনি সেখানে একটির পরে অপরটিকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে চলেছে। একটা কোন কিছুর কারণ যদি জানতে চাও, তাহলে সেই কারণটির আগে কোন কারণ ছিল তাই তোমাকে খুঁজে দেখতে হবে; একটা কোন কিছুর ফল যদি পেতে চাও তাহলে কোন ফল থেকে সেই ফল আসতে পারে তা তোমাকে খুঁজে দেখতে হবে। প্রত্যেকটি কারণ ও তার পরিণামে মিলে এক-একটি সম্পূর্ণ বৃত্তবলয় রচনা করেছে। এই খাঁটি জড়ের স্তরে কেবল প্রাণের স্তরই উঁকি দিতে পারে, যেমন দেখা যায় উদ্ভিদ-জগতে।

প্রাণের স্তরের নিয়তি আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের, সে নিয়তি কেবল তারই নিজস্ব। প্রাণের নিয়তিকে যখন জড়ের নিয়তির মধ্যে এনে ফেল, তখন দুই মিলে সব ওলটপালট হয়ে যায়।

প্রাণের স্তরের উপরে এল মনের স্তর। এরও আবার এক নিজস্ব নিয়তি রয়েছে, তাতে কেবল মনের জিনিসগুলিই পরস্পরের সঙ্গে কঠিন কার্য-কারণের পরম্পরাক্রমে শিকল গাঁথা।

এগুলির প্রত্যেক স্তরের নিয়তিই চলেছে এক সমতল অনুভূমিক ছন্দে।

তা ছাড়া নিয়তির উল্লম্ব গতিও আছে। অর্থাৎ মনের স্তর লম্বালম্বি দিক দিয়ে প্রাণের স্তরেও নেমে আসতে পারে, প্রাণের স্তর জড়ের স্তরেও নেমে আসতে পারে। তখন তিন রকমের নিয়তিতে মিলে একটা সম্পূর্ণ আলাদা কিছু গড়ে তোলে।

মন যেখানে নেই তার নিয়তির সঙ্গে, মন যেখানে জন্মেছে তার নিয়তির তফাৎ হবেই। উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে যেখানে মনের ক্রিয়া রয়েছে সেখানকার নিয়তির সঙ্গে উদ্ভিদ স্তরের নিয়তির অনেকখানি তফাৎ। আবার ওর উপরে উপরে আরো নানা স্তর রয়েছে। সবার উপরকার স্তর যেখানে, সেখানে সম্পূর্ণ মুক্তি।

তুমি যদি তোমার চেতনাকে লম্বালম্বি ভাবে সকল স্তরগুলি অতিক্রম করিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে উঠতে পার, এবং তার পরে অবাধে সব স্তর দিয়ে ওঠানামা করে সর্বোচ্চ পূর্ণমুক্তির নিয়তিকে এখানকার জড়স্তরের নিয়তির মধ্যে নামিয়ে আনতে পার, তাহলে এখানকার সমস্ত ব্যাপারই বদলে দিতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্তী স্তরগুলিরও বদল হয়ে যাবে। এই পরিবর্ত্তনে যা ঘটবে তাকে সর্বৈব মুক্তির মতই দেখাবে। কারণ উপরের স্তরের ব্যাপার নীচের স্তরে নেমে আসাতে তার ফল

যা হবে তা অভাবনীয়। উপরের স্তরে সে কথা জানা থাকতে পারে, কিন্তু নীচেকার স্তরে তা অজ্ঞাত। এমনি অজ্ঞাত থাকায় নীচের স্তরে যা ঘটবে তাকে অপ্রত্যাশিত রকমের পূর্ণমুক্তির অবস্থা বলেই বোধ হবে।

কেবল তুমি যদি সচেতন হয়ে সর্বক্ষণ সেই সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ অতিমানস চেতনার স্তরে উঠে অবস্থান করতে পার, তাহলে দেখবে যে সব কিছুই আগের থেকে সম্পূর্ণরূপে ঠিক করা আছে, অথচ সব রকমের নিয়তি একত্রে মিলতে পেরেছে বলে সেখানে কোন দিকে কিছু বাঁধাবাঁধি নেই, সকল দিকের পথই সম্পূর্ণ মুক্ত। একে তুমি যে নামই দাও, কিন্তু এমনি-ভাবে নির্ধার্য নিয়তি ও পূর্ণমুক্তি রয়েছে একত্র জড়ান। সে এমন স্তর যেখানে কোন বিরোধ নেই, সবই সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে মিলিত, বিভিন্ন হলেও বিরুদ্ধতা নেই।

(৩)

সমস্ত কিছুই সম্ভব। এ-যেন তোমার নিজের অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত এক রাজপথ বেয়ে ক্রমশ উন্মেষিত হতে হতে এগিয়ে যাওয়া। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাই ধারা, এখানে সকল কিছুই ক্রমশ উন্মেষিত হতে থাকবে। কিন্তু সে কেমন নিয়মে এবং কোন পথে? সব কিছুই এখানে সর্বতোভাবে বিদ্যমান, অথচ আপাতনিশ্চল। তারই থেকে সব কিছু এই বাস্তব জগতে বাস্তবরূপে ক্রমিক বিকাশ পাবে, স্বাভাবিক গতিতে, অল্পবিস্তর আগেপিছে। কিন্তু সে উন্মেষ কোন নিয়মে অগ্রসর হবে?

মাথার উপর রয়েছে অবাধ মুক্তির অনন্ত রাজ্য। তাহলে কে বলতে পারে যে তীব্র আস্পৃহা থাকলে, অতিশয় ব্যাকুল প্রার্থনা থাকলে, এই উন্মেষের নিয়মিত ক্রিয়াই অনুরূপ অনিয়মিত মুক্তির ধারায় প্রবাহিত হবে না? তাই বলছি, সব কিছুই সম্ভব। আর মানুষকে সেই অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনার সৌভাগ্য দেওয়া রয়েছে। কেবল তুমি জান না সেই সৌভাগ্যকে কেমন করে সফল করে নিতে হয়।

নির্ধার্য নিয়তির ক্রিয়া চলেছে একই সমতল ক্ষেত্রে, কিন্তু যদি তুমি তাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে চেতনার সর্বোচ্চ সীমান্তে গিয়ে পৌঁছতে পার, তাহলে যাকে এখন মনে হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী নিয়তি তাও বদলে যেতে পারে।

সকল তত্ত্বই শুধু তত্ত্ব মাত্র, সবই আসল বস্তুর মনগড়া ব্যাখ্যা কিংবা প্রতিচ্ছায়া, মূল সত্য কোনটাই নয়। যখন বল "নিয়তি" কিংবা "মুক্তি", সেও কেবল কথার কথা। সবই অসম্পূর্ণ,—এবং যা শেষ পর্যন্ত পরম সদ্‌বস্তু, যা তোমার আমার মধ্যেও রয়েছে, আমাদের চতুর্দিকেও রয়েছে, যা সর্বত্রই বিরাজিত, তারই একটু ক্ষীণ প্রতিভাস মাত্র। কেমন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তা একটু বুঝতে চাইলেও তোমাকে এই সব মনগড়া তত্ত্বকে ছাড়িয়ে চলে যেতে হবে; নইলে কখনই কিছু বুঝবে না।

এক মিনিটের জন্যও যদি পূর্ণ ঐকান্তিক আস্পৃহার মধ্যে এবং গভীর আন্তরিক প্রার্থনার মধ্যে ডুবে যেতে পার, তাহলে অনেক ঘণ্টাকাল ধ্যানে বসে থাকার চেয়েও ওরই মধ্যে অনেক বেশি তোমার জানা হয়ে যাবে।

ধ্যান ও সচেতনা

গভীর ধ্যানের মধ্যে বা অভ্যন্তরলোকে ডুবে যদি তুমি নিশ্চেতন সমাধিতে তলিয়ে যাও তাহ'লে কিন্তু তোমার সাধারণ চেতনা রূপান্তরিত হবে না, যেমন ছিল তেমনি থাকবে। যারা ধ্যানের মধ্যে উচ্চতর চেতনাতে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তারা সেই ধ্যান থেকে বেরিয়ে এলেই আবার যেমন ছিল তেমনি হয়, আগের চেয়ে তাদের দাম কিছু বাড়ে না। সেই উপর থেকে সাধারণ চেতনাতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগের দোষত্রুটি সবগুলোই আবার ফিরে আসে। (শ্রীরামকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন। গঙ্গাস্নানের পুণ্যফলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন, গঙ্গায় ডুব দিলেই পাপগুলো সব ছেড়ে যায়, কিন্তু তারা কিনারায় অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে, জল থেকে উঠলেই আবার তারা পেয়ে বসে।) এমন ধ্যানীদের উন্নতি হয় না; কারণ তাদের বাহ্যের সঙ্গে গভীর সত্তার ও গভীরতর অনুভূতি চেতনার মিলন ও সংযোগ হয় না। নিদিধ্যাসনে বসে যখন তারা ধ্যানে ডুবে গভীরতর অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে চলে যায়, তার আগে নিজেদের বাহ্যকে খোলসের মত পাশে রেখে দিয়ে বলে, "ওখানেই থাক বাপু, এখন বিরক্ত কর না"; আবার ধ্যান ছেড়ে সেই খোলসটি পরে কিন্তু সে তো কিছু বদলায়নি, বরং আরো মলিন হয়ে গেছে। তাই আগে যেখানে ছিল সেখানেই তারা থাকে, হয়তো ধ্যান করা সত্ত্বেও প্রকৃতি আরো বিগড়ে যায়। বাহ্যকেও যদি বদলাতে চাও তাহলে তার সম্বন্ধে চেতন থাকবে, চেতন থেকেই

অনুভূতি নেবে : ধ্যান থেকে পূর্ণ সাফল্য পেতে চাইলে বাহ্য সত্তার সংস্পর্শ ছাড়লে চলবে না।

অনেক লোক আছে যারা বহু ঘণ্টা যাবৎ প্রায় সর্বক্ষণই ধ্যান করছে ; কিন্তু তার মধ্যে যদি কেউ এসে ডাক দেয় কিংবা কোন শব্দ করে, অমনি তারা রেগে চেঁচিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে। তারা যদি ধ্যান করার বদলে সাধারণ লোকের মত থাকত সেও বরং ছিল ভাল, কিন্তু ওতে তার চেয়েও খারাপ জিনিস হয়। তার কারণ সেই একই কথা, বাহ্যের সঙ্গে তাদের গভীরের কোন মিল নেই : দুই ভাগে তারা ভাগ করা, এক ভাগ ভিতরের দিক থেকে এগিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু আর এক ভাগ বাইরে অবহেলায় পড়ে থেকে আরো বেশি বিকৃত হতে থাকে।

বিপরীত কিছু ঘটলে

যে জিনিস তুমি চাও না তা এসে পড়লে তাকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া আলাদা কথা, আর চেতনাকেই এমন বদলে ফেলা যে সেই জিনিস তোমার প্রকৃতির কাছে আপনা থেকে নিষ্ক্রিয় নিষ্ফল হয়ে গেল, এ হল সম্পূর্ণ আলাদা কথা। সাধারণতঃ যখন তোমার মধ্যে এমন কিছু ক্রিয়া জাগে যা তুমি পছন্দ করছ না, তখন তুমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে চাও, কিন্তু নিজের মধ্যে একবারও চেয়ে দেখ না যে তার দিকে একটা ঝোঁক বা চেতনার টান তোমার নিজের মধ্যেই রয়ে গেছে, যেটি ববাবরই সেই জিনিসকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে এবং এখনও দিচ্ছে। সুতরাং কেবল তাকেই দোষী করে বা দাবিয়ে দেবার চেষ্টা না করে যদি আপন প্রাণচেতনার তলদেশে খুঁজে দেখ, তবে দেখবে সেখানেই রয়েছে তার প্রশ্রয়ের মূল কেন্দ্র, ভিতরকার সেই দূর প্রান্ত থেকে আসছে এক ধরনের সূক্ষ্ম আকর্ষণের স্পন্দন, আর সেই স্থানটি এমনই অন্ধকার যে তার মধ্যে স্পষ্ট করে কিছু দেখাই কঠিন। তৎসত্ত্বেও যদি তুমি একাগ্র হয়ে খুঁজে বের করতে চাও যে কিসের থেকে ঐ আকর্ষণ ক্রিয়ার উৎপত্তি হচ্ছে, তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে যে খুবই ছোট একটি সাপের মত জিনিস সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, মটরদানার চেয়ে বেশি বড় নয় আর অত্যন্ত কাল, সেটি সেখানে খুব জোরের সঙ্গে এঁটে বসে রয়েছে। দেখতে পেলে তুমি তাকে তাড়াবার দুই উপায় করতে পার: হয় তার উপরে সত্যচেতনার তীব্র আলো ফেলতে থাক, ওর আলো এতই প্রখর যে তার তেজে

ঐ জিনিস সম্পূর্ণ গলে যাবে,—কিংবা তাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরার মত টেনে বাইরে বের করে এনে নিজের চেতনার দৃষ্টির সুমুখে তুলে ধর। এই দুইএর মধ্যে প্রথম উপায়টি হল অব্যর্থ, কিন্তু সেই সত্যচেতনার আলোটি তোমার নাগালের মধ্যে না থাকলে তাকে নিজের ইচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারবে না। সুতরাং তোমাকে তখন দ্বিতীয় উপায়টি ধরতে হবে। ওতে অবশ্য যন্ত্রণা পেতে হবে যথেষ্ট, দাঁত উপড়ে ফেলার সময় যেমন যন্ত্রণা পেতে হয়। এ-বিষয়ে তোমাদের কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানি না, কিন্তু কাজটি বাস্তবিকই কষ্টকব। কিন্তু এদিকে ভেবে দেখ যে নিজেদের মধ্যে কোন একটা অবাঞ্ছিত ক্রিয়া ঘটতে দেখলে তোমরা যে তাকে দুর্বল হাতে মুছে ফেলতে চেষ্টা কর,—কিংবা আপাতত কোন গতিকে চাপা দিয়ে রাখতে যাও, তাতে সেটি তেমনি ভাবেই বজায় থেকে যায়। সেখানে জোর করতে ততটা সাহস কর না বলে সে জিনিস আর বদলায় না। তাকে উপড়ে ফেলতে গেলেই টন্‌টন্‌ করতে থাকে, ব্যথাও লাগে বুকেব মধ্যে। তবুও তাকে চাপা দিয়ে রাখার চেয়ে সাহস এনে উপড়ে ফেলাই ভাল। বাইরে টেনে বের করে এনে চোখের সামনে তাকে তুলে ধরবে; তাহলে সেটি দূর হয়ে যাবে। ও আপদ একেবারেই তখন ঘুচে যাবে, আর তুমিও সেরে উঠবে। অতঃপর সে আর তোমায় কখন বিরক্ত করতে আসবে না। ফোড়া অপারেশন করে ফেলার মত সেখানে এই চূড়ান্ত ব্যবস্থাই করতে হবে।

'প্রথমে অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ওর মূল খুঁজে বের করা চাই। নইলে তোমার মন ওর সমর্থনে হাজার রকম কারণ

দেখাতে থাকবে, অনেক ব্যাখ্যা বিস্তার করবে, তাতে কোথা থেকে কি হচ্ছে সে সন্ধানে আর তুমি অগ্রসর হবে না। মন বলবে, "না না, এতে তোমার নিজের দোষ কি আছে; ঘটনাচক্রে এমন হয়ে গেছে, লোকেই এটা করিয়েছে, বাইবের প্ররোচনায় এমন অনেক কিছু হয়ে পড়ে, এটা হয়েছিল অমুকের দরুন, তমুকের দরুন",—সকল কৈফিয়ৎই বেশ জোরালো, কাজেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে তখন তুমি তাকে সেবারকার মত ছেড়ে দেবে, তার পর সে যেমন ছিল তেমনি হয়ে দাঁড়াবে; আবার সেই জিনিস স্পষ্ট দেখা দিয়ে তোমাকে বিরক্ত করতে থাকবে, আবার তখন গোড়া থেকে সব শুরু করতে হবে।

কিন্তু তুমি যদি একেবারে অপারেশন করে ফেল তাহলে আপদটাই ত চুকে যায়। মনকে এবং তার ফুসলানিকে একটুও বিশ্বাস কর না। তোমায় দিয়ে এমন কথাও সে বলিয়ে নেবে: "হাঁ হাঁ, এর আগের বারের সম্বন্ধে তাই বটে, তখন আমারই দোষ ছিল স্বীকার করছি; কিন্তু এবারের বেলা তা হয়নি, এখানে আমাব নিজের দোষ নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" শত্রুকে শক্ত হাতে চেপে না ধরলে সে অবচেতনের কোন এক কোণে দিব্যি লুকিয়ে থাকবে, আর যখনই তুমি একটু ঢিল দেবে তখনই অমনি বেরিয়ে আসবে। এমন ব্যক্তির কথা আমি জানি যে নিজের ভিতরকার দুর্বলতাকে এই ভাবে পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। যদি তেমন স্থায়ী দোষকে সমূলে উচ্ছেদ করা না হয় তাহলে তা জন্মান্তরে গিয়েও টিকে থাকতে পাবে। তাই ওর পক্ষে সব চেয়ে সমুচিত ব্যবস্থা হল যেমন করে হোক পূর্বোক্তভাবে অপারেশন করে বাদ দিয়ে

দেওয়া। তাহলে ওর থেকে চিরকালের মত নিষ্কৃতি পাবে। যদি ওর উপরে সত্যের তীব্র আলো ফেলতে পার তাতে সে জায়গাটি হয়তো পুড়েই যাবে কিংবা ঝল্‌সে যাবে, কিন্তু সে কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হবে। সে সময়টিতে এমন মনের জোর থাকা চাই যাতে পিছু হটে না যাও, যেমন তেমন করে চাপা দিয়ে সরে না পড়। বরং সে জায়গাটি উন্মুক্ত করে রাখতে হবে, সামনে দাঁড়িয়ে বুক পেতে ঘা সইতে হবে।

আগে বলেছি, সেই ছোট কাল বস্তুটি কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করা চাই। সত্তার মধ্যে তার লুকোবার অনেক জায়গা থাকে। কারও বেলা মাথার মধ্যে, কারও বুকের মধ্যে, কারও বা তার চেয়ে নীচের দিকে; কিন্তু যেখানেই লুকিয়ে থাক, তার যখন সন্ধান মিলবে তখনই দেখবে সেটি একই ধরনের কুণ্ডলী পাকান কাল পোকামাকড়ের আকৃতি সেই সাপ, যেন একটা ছোট মটরদানার মত, কিন্তু বজ্র আঁট হয়ে লেগে আছে। মাথার ভিতর থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন হয়। কারণ সেখানে ভিড় করে থাকে নানা রকমের ভুল ধারণা, সেগুলিকে এড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে পথ করে খুঁজতে যাওয়া সহজ কথা নয়। আর বুকের মধ্যে থাকলে তাকে খুঁজে পেয়ে উপড়ে ফেলা ওর চেয়ে সহজ বটে, কিন্তু তাতে যন্ত্রণা পেতে হয় সব চেয়ে বেশি। তবে ঐ কথা ঠিক যে সেখানে সহজে খুঁজেও মেলে আর তাড়ানও যায়। আর ওর চেয়ে নীচেকার প্রাণের স্তরে সব কিছুই এলোমেলো কাণ্ড। সেখানে সব কিছুই একসঙ্গে মিলে তালগোল পাকিয়ে থাকে। ঐ জায়গার ক্রিয়াগুলিও যেমন

অন্ধ, তেমনি তা অসংযত, তেমনি অতি প্রচণ্ড। তার মধ্যে একসঙ্গে রয়েছে ভীতি, আত্মম্ভরিতা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, আসক্তি, উচ্ছ্বাস, আর আছে সেই ক্ষুধা যাকে তোমরা প্রেম বল। এ-ছাড়া আরো একশ রকমের জিনিস সেখানে রয়েছে। মাথার মধ্যেও বহু রকমের জিনিস আছে। তার মধ্যে আছে চিন্তার বিকার, আর আছে প্রতারণা, নিজেরই অন্তরাত্মার সঙ্গে প্রতারণা। নিজেই নিজেকে কতরকমভাবে প্রতারণা করছ, অথচ খুব জোরের সঙ্গে, সে যে তুমি অন্যায় করছ এ-বোধকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তোমার মস্তিষ্ক যে কত রকমের সাফাই দেখাচ্ছে আর সপক্ষের যুক্তি এনে হাজির করছে তা ঠাহর করতেই পার না। এই সব বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জিনিসের জটিলতা একেবারে ছাড়িয়ে ফেলতে হবে, প্রত্যেক জিনিসকে তার স্বস্থানে আলাদা করে বেছে রাখতে হবে, তার পরে তোমার সত্য চেতনার আলো ফেলে তার বিচার করতে হবে—প্রকৃত দোষ দেখলে হয় তাকে পুড়িয়ে ফেলবে, নয়তো সংশোধন করে নেবে, নয়তো রূপান্তরিত করে নেবে।

স্বয়ংপ্রয়াস ও সমর্পণ

এই দুই রাস্তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোনই প্রভেদ নেই, যদি নির্ব্যক্তিক ভগবানই তোমার লক্ষ্য হয়, অর্থাৎ নির্ব্যক্তিক ঈশ্বরের মধ্যে যদি লয়প্রাপ্ত হতে, একাত্মভাবে তার সঙ্গে মিলিত হতে চাও। কিন্তু যদি তোমার আস্পৃহা থাকে সেই অবস্থাকেও ছাড়িয়ে চলে যেতে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অতিমানস সত্তা সেখানে গিয়ে পৌছতে, তাহলে এখানেই প্রভেদ এসে গেল, কারণ সে ক্ষেত্রে লক্ষ্যও আলাদা আর সেই লক্ষ্যে পৌছবার রাস্তাও আলাদা। অতিমানস উপলব্ধিতে যাবার আসল রাস্তাই হল সমর্পণের রাস্তা। তবে তা হয়তো নিজের নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তোমার প্রকৃতিতে যদি স্বাভাবিকরূপে ঐদিকে প্রবণতা থাকে, তাহলে এই সমর্পণের রাস্তাই অনেক বেশি সহজ হবে : তোমার যত কিছু অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির বোঝা রয়েছে তার চার ভাগেব তিন ভাগ ওতে আপনা থেকেই নেমে যাবে। তবে কারো কারো পক্ষে এ-রাস্তা বেছে নেওয়া সব চেয়ে বেশি কঠিন হয়।

সাফল্যের দিক দিয়ে বলতে গেলে, এক পথ হল বাঁধা একটি সরলরেখার মত, এবং তা পৌছবে গিয়ে নির্দিষ্ট একটি বিন্দুবৎ স্থানে ; আর অন্য পথটি চলেছে বিস্তৃত এক বৃত্তাকারে, সে গিয়ে পৌছবে বিশাল এক সমগ্রতায়। যে যেমন পথেই চলুক, সে আপন আপন লক্ষ্যের মূলে এবং চরমে গিয়ে পৌছবে, আর তখন দেখা যাবে যে সে একই জিনিস, একই শাশ্বত, অসীম, পরাৎপর সদ্‌বস্তু। প্রান্তে গিয়ে পৌছন মানেই সেই

পরাৎপরে গিয়ে পৌঁছান, যদিও তুমি চলবার সময় চলেছ নিজের লাইন ধরে—এ কথার শব্দার্থটি কিন্তু ধরবে না, বোঝাবার সুবিধার জন্য এই ভাবে বললাম। তাই বলছি, একটা লাইন রাস্তা ধরে চললে গিয়ে পৌঁছবে একটি বিন্দুতে, কিন্তু তোমার কাছে সেই বিন্দুই হল পরাৎপর, তোমার সিদ্ধির সম্ভাবনার সেখানেই চরম। আর অন্য রাস্তায় গেলে তুমি পৌঁছবে এক বৃত্তাকার উপলব্ধিতে; বৃত্তাকার বলছি এইজন্য যে সেই বৃত্তের মধ্যে সব কিছুই বিধৃত রয়েছে, সেখানে সে বিন্দুমাত্র নয় এবং তার থেকে কোন কিছুই বাদ থাকল না।

কিন্তু অংশবস্তু আর সমগ্রবস্তু, সে তুলনা এখানে খাটে না। কারণ অংশ বলতে এখানে কিছু নেই। প্রশ্নটা অন্যরকম। জলের বেলাতে কি এমন বলা চলে যে এক বিন্দু জলের সঙ্গে একাত্ম হলেই বোঝা যাবে সমুদ্র কেমন? কিন্তু এখানে তাই হবে, বিন্দুর সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই কেবল সমুদ্র নয় কিন্তু মহাসমুদ্রের সঙ্গেও তুমি একাত্ম হবে। এক বিন্দু জলের মর্ম জানলে মহাসমুদ্রের মর্মটাও তুমি জেনে নেবে; কেবল মর্মটুকুই নয়, মহাসমুদ্রকে তখন তুমি সমগ্রভাবেই জানবে। তবে এই সত্যের আসল সন্ধান বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন। যথা-সম্ভব পরিষ্কার করে বলতে মোটের উপর এই বলা যায়: স্বয়ং-প্রয়াসের বেলাতে, অর্থাৎ যেখানে তুমি নিজের চেষ্টার উপরেই একান্ত নির্ভর করে আছ, সেখানে তোমার ব্যক্তিগত গুণগুলি যদিও পুরোদমে কাজ করবে, কিন্তু তেমনি তোমার ব্যক্তিশক্তির. সীমা কখনো তুমি লঙ্ঘন করতে পারবে না। অপরপক্ষে 'যখন তুমি নিজের ব্যক্তিত্বকে সমর্পণ করে দিলে, তখন কিন্তু তার

গুণগুলিও তেমনি কাজ করতে থাকবে অথচ তাকে সীমার মধ্যে আটক থাকতে হবে না। কথাটা হয়তো নিতান্ত দার্শনিক ধোঁয়ার মত শোনাচ্ছে। অতএব তেমন পরিষ্কার করে বলা গেল না। কিন্তু এ ছাড়া আর বেশি কিছু বলা যায় না।

ভিতরের যোদ্ধার আত্মসমর্পণ

এ কথার মানে আমাদের ভিতরের প্রাণসত্তা যখন আগের অভ্যাস ছেড়ে নিজের চরিত্র বদলে ফেললে। এই বদলে যাওয়া প্রাণসত্তা অহংএর তরফ ছেড়ে তখন ভগবানের তরফে যোদ্ধার কাজ করতে থাকে। মানুষের প্রাণসত্তা হল শক্তির এক-একটি আধার, এরই জোরে মানুষ লড়াই জয় করে। একে বাধ্য করে বশে রাখা খুব কঠিন কাজ: কারণ লড়বার শক্তি থাকাতে মাঝে মাঝে স্বাধীন হয়ে উঠবার জন্য সে বিদ্রোহও করে বসে, তখন সে নিজের ইচ্ছাতে চলতে চায়। কিন্তু যখন সে নিজের স্বভাব বদলে ফেলে আত্মসমর্পিত হয়, যথার্থই যখন সে ভগবৎ-ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দেয়, তখন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সে লড়তে থাকে যত অদিব্য শক্তিদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ যে সব অন্ধশক্তি ভগবানের রূপান্তরের কাজে বাধা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে: তখন এই সব শত্রু শক্তিদের হারিয়ে দেবার মত সে ক্ষমতা পায়। অদিব্য শক্তিরা রয়েছে প্রাণময় জগতের স্তরে: সেখান থেকেই জড়জগতের উপর তাদের আধিপত্য। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রেই তাদের শাসন বলে আমাদের প্রাণশক্তিই তাদের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে লড়তে পারে। কিন্তু আমাদের প্রাণশক্তিতে তেমন পরিবর্ত্তন আনতে পারাই কঠিন।

প্রাণসত্তার উচ্চাংশটুকুর পক্ষে আত্মসমর্পিত হওয়া খুব কঠিন নয়, কারণ মনের প্রভাব আর কখনো কখনো চৈত্যের প্রভাবও এসে পড়ে তার উপরে, সেখানকার যা বক্তব্য তা

সহজেই সে বুঝে এবং মেনে নেয়। কিন্তু নীচেকার প্রাণসত্তার পক্ষে তা করা কঠিন, কারণ সেখানে হল কামনা-বাসনা ও যত কিছু অন্ধ প্রবৃত্তির মূল ঘাঁটি। নিম্ন প্রাণসত্তাকে যখন সমর্পণে বাধ্য করান হয় তখন সে খুশি হয়ে তা করে না, তাতে সে যন্ত্রণা পেতে থাকে, আর নিজের প্রবৃত্তিকে চাপতে গিয়ে তাকে সে আরো বিদ্রোহী করে তোলে, সুতরাং তার আত্মসমর্পণ স্বেচ্ছাকৃত হয় না, হুকুমে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে তাই করতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ সে নিজে ভালবেসে আনন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রকৃত সহযোগিতা না করছে ততক্ষণ বিশেষ কিছু কাজ হবে না, রূপান্তর ওতে আসবে না।

সমর্পণ যদি পূর্ণ ও ঐকান্তিক হয় তবেই তা আনন্দদায়ক হয়। এ কথাটি ঘুরিয়েও বলতে পার, যখন দেখবে যে প্রাণসত্তা ওতে আনন্দ পাচ্ছে না, তখন নিশ্চিত জানবে যে সমর্পণ প্রকৃতপক্ষে ঐকান্তিক হয়নি। আর প্রাণসত্তা সুখী হতে পারছে না মানেই তার মধ্যে আলাদা খানিকটা অংশ তফাতে রয়ে গেছে, সেই আলাদা অংশটির চাহিদা রয়েছে অন্যরকম কিছু, এমন কিছু কামনা বা মতলব তার রয়েছে যার পূরণ হয়নি, তাই সেটুকু সমর্পিত হতে পারেনি, কাজেই আত্মসমর্পণ ঐকান্তিক হয়নি। কেউ যদি যথার্থই ঐকান্তিক ভাবে সমর্পিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রভূত আনন্দ তার আপনা থেকেই আসবে: সে আনন্দ হবে অবর্ণনীয়। এই অবর্ণনীয় ভাবটি যেখানে নেই, সেখানে আন্তরিকতার কিছু যে অভাব আছে ওটি তারই নিশ্চিত চিহ্ন।

তোমার ভিতরকার কোন অংশটি এমন বেঁকে আছে তা

যদি আবিষ্কার করতে চাও, তাহলে তোমাকে সেজন্য আস্পৃহা করতে হবে, নিরন্তর প্রয়াস করতে হবে, ভিতরে আলো ফেলতে হবে,—দরকার হলে প্রার্থনা করতে হবে। তদ্ভিন্ন আরো অনেক উপায় আছে। কখনো-বা কিছু অস্ত্রোপচারের দরকার হতে পারে, দুষ্ট স্থানে আগুনের ছেঁকা দেবার দরকার হতে পারে, অর্থাৎ যেখানে দুষ্ট ব্রণটা কিছুতে ফাটছে না সেখানে তাকে ফাটাবার জন্য যা যা ব্যবস্থা করা দরকার হয়।

ভগবানের দিকে উন্মীলন

ভগবানের দিকে উন্মীলিত থেকে তাঁকে নিজের মধ্যে ডেকে নিতে হবে। এমনিতে তুমি জগতের সব কিছুব দিকে উন্মীলিত হও, সকলের সম্বন্ধেই উন্মীলিত থাক। সে কাজটি করে তোমার বাহ্য সত্তা, তারই মাধ্যমে সব দিক থেকে সব রকমের প্রভাব তোমার মধ্যে এসে ঢোকে। তার ফলে অনেক বিপরীত ধরনের জিনিস ও পরস্পরবিরোধী ক্রিয়া তোমার মধ্যে তালগোল পাকাতে থাকে: অসংখ্য রকম বিপত্তির সৃষ্টি হয় তার থেকেই।

ওর বদলে নিজেকে বাইরের দিক থেকে সরিয়ে আন, আর ভগবানের দিকে নিজেকে উন্মীলিত রেখে বল যে তাঁর দিব্যশক্তি ছাড়া আর কোন কিছুকেই ভিতরে ঢুকতে দেবে না। এই যদি করতে পার তবে মোটের উপর সকল বিপত্তি ঘুচে যাবে। কিন্তু সেটি বেশ কঠিন কাজ। লোকের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক রেখে চলবে, তাদের সঙ্গে যথারীতি বাক্যালাপও করবে আর লেনদেনও করবে, অথচ তাদের কোন প্রভাবকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না, রাসায়নিক শোধন না ঘটলে এমন করতে পারা অসম্ভব। এমন এক পরিশীলনের আবহাওয়া তৈরি করে নিজেকে তাই দিয়ে যদি সর্বক্ষণ ঘিরে রাখ যা সর্বদাই নিখুঁত ছাঁকনির মত কাজ করবে, তাহলে বাইরের দিক থেকে যাই কেন আসুক তা আগে ওতে ছাঁকা হয়ে না এলে তোমাকে মোটে স্পর্শই করতে পারবে না। কিন্তু এর জন্য চাই সমুচিত শিক্ষা ও প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেইজন্যই আগেকার কালে যারা সহজ রাস্তা খুঁজত তারা লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চলে

যেত, দুর্গম পাহাড়ে উঠে গুহার মধ্যে আশ্রয় নিত, মানুষের সংস্রবমাত্র যেখানে নেই, তাতেই তারা এগুলোর প্রভাব এড়াতে পারত। কিন্তু তাতেও দেখা গেল যে মানুষের সংস্রব ছেড়ে নির্জনে চলে গেলেও বনের গাছপালা এবং জীব-জন্তুদের জীবনের সঙ্গে আবার নতুন রকম সংস্রব এসে পড়ে : আদৌ কোন কিছুর সঙ্গেই সংস্রব থাকবে না এমন ভাব বজায় রাখা খুবই কঠিন। অতএব সবচেয়ে ভাল উপায় হল এ সমস্যাকে এড়াতে চেষ্টা না করে সরাসরি মেনেই নেওয়া, আর ভগবানের দিকে সর্বদা একাগ্র থেকে এমন আবহাওয়া দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখা যাতে সেই ছাঁকনির গণ্ডীর ভিতর দিয়ে পার না হয়ে কোন কিছুই তোমার মধ্যে পৌছতে না পারে।

এ ছাড়া আবার খাদ্যের দিকের কথাটাও রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য হিসাবে বাইরের অনেক জিনিসকে দেহের মধ্যে ঢোকাতে হয়, তার সঙ্গে কিছু জড়শক্তি কিংবা অচেতনা বা অবাঞ্ছিত চেতনাও এসে প্রবেশ করে। এ কথা তোমাদের আগেও বলেছি। এই কারণে প্রায় সকল যোগেই নির্দেশ দেওয়া হয় যে কোন কিছু খাবার আগে তা ভগবানকে নিবেদন করে দেবে, তার পরে সেটি খাবে : এর মানে খাবার আগে ভগবানকে তুমি সেই খাদ্যের মধ্যে আহ্বান করলে। খাদ্যকে নিবেদন করে দেওয়া মানেই ভগবানের সংস্পর্শে তাকে আনা : অর্থাৎ তার মধ্যে তখন তাঁর প্রসাদ এবং প্রভাব এসে পড়ল। এ নিয়ম খুবই ভাল ; বাস্তবিক কেমন করে নিবেদন করতে হয় তা যদি তোমার জানা থাকে, তাহলে ভিতরের রূপান্তরের সম্বন্ধে অনেক পরিশ্রমই তোমার কমে

যায়। কারণ জগতে সকল কিছুর সঙ্গে সন্নিবদ্ধ হয়েই আমাদের বাস করতে হয়। এমনকি প্রত্যেকটি প্রশ্বাস যখন তুমি নিচ্ছ, তার সঙ্গে বাইরের কত জিনিস থেকে ও কত মানুষ থেকে অসংখ্য ধরনের স্পন্দনগুলিও তোমার মধ্যে এসে ঢুকছে। অতএব নিজেকে ঠিক রাখতে হলে অমনি ছাঁকনির মত আবহাওয়ার ঘের দিয়ে রাখতেই হবে, যাতে অবাঞ্ছিত প্রভাব কিছু ভিতরে ঢুকতে না পায়। কিংবা বিষাক্ত পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে চলতে হলে যেমন গ্যাসমুখোস ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় তেমনি কিছু একটা ব্যবস্থা করা চাই।

পূর্ণ সমর্পণের ভাব এনে নিজের চারিদিকের আবহাওয়াকে এমন ঘনীভূত করে তুলবে, যে তার মধ্যে যাই ঢুকুক তা আপনা থেকেই ছাঁটাই হয়ে যাবে। তোমার আশেপাশে নিত্যই কত অশুভ ইচ্ছা আর মন্দ লোকের অশুভ শক্তি ঘোরাঘুরি করছে। সেগুলি অদৃশ্য রোগবীজাণুদের মত অপকারী, চারিপাশের বাতাস তাতে বিষিয়ে রয়েছে। সকল সময় সতর্ক হয়ে তো থাকা যায় না, পদে পদে অতি সন্তর্পণে সকল দিকে নজর রেখে পা বাড়ানো যায় না; আর তা করলেও সব সময় নিরাপদে থাকা যায় না। কিন্তু তুমি যদি ঐকান্তিক সমর্পণ ও আস্পৃহার জ্যোতির্ময় আচ্ছাদনে নিজেকে ঢেকে রাখতে পার, তাহলে তাই হবে তোমার পক্ষে চমৎকার এক বর্মস্বরূপ, তাতে আপনা হতেই তুমি সুরক্ষিত থাকতে পারবে। অশুভ শক্তিগুলি যে কেবল প্রবেশের পথ পাবে না তাই নয়, যেখান থেকে আসছিল সেখানেই আবার তাদের ফিরে যেতে হবে, সুতরাং যারা তোমাকে আক্রমণ করতে চাইবে তারাই হবে আক্রান্ত।

ভগবানে বিলীন হওয়া

প্রশ্ন : কেমন করে ভগবানে বিলীন হওয়া যায় ? অর্থাৎ আপন অহংকে হারিয়ে কেমন করে ভগবানের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া যায় ?

উত্তর : প্রথম কথা, তার জন্য ইচ্ছা করা চাই, সংকল্প করা চাই, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাই আস্পৃহা করা চাই। যতবার তোমার অহং মাথাচাড়া দেবে ততবারই তাব নাকে ঘুঁষি মেরে তাকে দাবিয়ে দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্লান্ত হয়ে শেষে থেমে না যায়। সাধারণতঃ লোকে তা কিন্তু করে না, বরং নিজের অহংকে প্রশ্রয় দিয়ে তার ন্যায্যতা স্বীকার করে। অহংভাব এলেই বলে "ঠিক কথাই তো হচ্ছে", তারা জানেও না যে ওটা অহং, মনে করে যে এই আমার আত্মা। সুতরাং আগে দেখা চাই যে অহং জিনিসটা একেবারেই না থাকে। যখন তুমি বলবে যে আমি আর অহং চাই না তখন কি তার অর্থ সেটা বুঝতে হবে। তা খুব সহজ নয়। কারণ যখন তোমার মাথার মধ্যে এই ভাব পোষণ করছ, "অহংকে আমি চাই না, ভগবান থেকে স্বতন্ত্র হতে চাই না", তখন জীবনের বেলাতে তার বিশেষ কিছু ফল হচ্ছে না; যখন তুমি বস্তুতঃ কোন স্বার্থপর বা অহংপূর্ণ কাজ করে ফেলছ, তখন তা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছ; তাতে তোমার মনে কোনরকম ধাক্কা লাগছে না।

সুতরাং আগে বোঝা চাই যে কথাটার প্রকৃত অর্থ কি। এর মধ্যে অনেক স্তরভেদ আছে। প্রথমে জানতে হবে যে এই

দুটির মধ্যে কি পার্থক্য : (১) স্বার্থবোধ (২) অহমিকা। স্বার্থবোধ জিনিসটা খুবই স্থূল, সুতরাং তাকে বা তার অধিকাংশকে বর্জন করা খুব কঠিন নয়। ওটা নিতান্ত ছেলেমানুষি হাস্যাস্পদ ব্যাপার জেনে অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। একজন স্বার্থপর ব্যক্তি যে কতখানি অসঙ্গত তা তুমি দেখতে পাও না। সে কেবল নিজের কথাই ভাবছে, সবকিছু নিজেরই দিক থেকে দেখছে আর নিজের ক্ষুদ্রত্বের দ্বারাই চালিত হচ্ছে, নিজেকেই বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ জেনে বিশ্বকে এবং ভগবানকে পর্যন্ত সেই হিসাবে বিচার করছে, যেন বিশ্বের মাঝে তারই দাম সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি যদি অনাসক্ত ভাবে বাইরের দিক থেকে নিজেকে লক্ষ্য কর, আয়নাতে মুখ দেখার মত, তাহলে তখনই দেখতে পাবে যে ক্ষুদ্র তুমিকে বড় ভাবা কতই হাস্যকর। ফরাসী ভাষাতে টেগোরের তর্জমা করা (রবীন্দ্রনাথের) একটি লাইন পড়ে খুবই আমোদ বোধ করেছিলাম। সে হল একটি ছোট কুকুরের কথা, সে তার মনিবনীর কোলের মধ্যে বসে ভাবছে যে সেই হল সর্বজগতের কেন্দ্রস্থল। এমনি একটি কুকুরের সম্বন্ধে সত্যই আমি জানতাম। অনেকেই এই ধরনের হয়ে থাকে, বোধকরি সকলেই তাই; তারা চায় যে অন্যান্য সকলে যেন কেবল তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, এবং হয়ও তাই।

তোমার অহংকে ভগবানের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হলে তোমার অনেকখানি পথ যেতে হবে। প্রথম কথা, যতক্ষণ তুমি পুরোপুরি একটি ব্যক্তিসত্তা না হয়েছ ততক্ষণ নিজেকে ভগবানে মিলিয়ে দিতে পার না। পুরোপুরি একটি ব্যক্তিসত্তা

হতে পারার মানে কি তা জান? তার মানে নিজেকে সকল বাহ্য প্রভাব থেকে বিমুক্ত রাখতে পারা। সেদিন একজন আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে বই পড়তে সে ভয় পায়, কারণ যাই সে পড়ে তারই সঙ্গে তার একাত্মভাব এসে যায়; কোন নভেল বা নাটক পড়লে তার ভিতরকার চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেই সব চরিত্রের ভাব ও চিন্তাধারা তার মধ্যে এসে যায়। অনেকেই এমন হয়। কোন একটা বই পড়তে শুরু করলেই তারা তারই ভাবধারার প্রভাবে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে নিজেরাও তাই হয়ে পড়ে, আপন অজান্তে। এর কারণ তাদের প্রকৃতির নিরানব্বই ভাগই মাখনের মত নরম, তার মধ্যে আঙুল দিলেই দাগ পড়ে। সাধারণ মানুষের চরিত্রই এইরকম। অন্যদের চিন্তাগুলো অনায়াসে তাদের মধ্যে ঢুকে যায়, কোন বইএর একটা কথা, দৃষ্টিপথে পড়া কোন একটা ঘটনা, প্রতিবেশীর কোন ইচ্ছার কথা তাদের মনের মধ্যে মিশে জড়িয়ে যায়, আবার তা বেরিয়ে গিয়ে অন্যগুলো এসে ঢোকে, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত। অথচ তা নজরে পড়ে না। এইসব বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, প্রত্যেকটাই চায় প্রধান হতে, এবং মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় সমুদ্রতরঙ্গে দোলায়িত সোলাখণ্ডের মত।

এইরূপ অব্যবস্থিত অচেতন কাদার তালের বদলে তোমাকে হতে হবে সচেতন, দৃঢ়চিত্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আপন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিজের ভাবে স্থির অবিচল রাখতে পারা, যাতে কোন কিছু পড়ে বা শুনে বা দেখে টলটলায়মান হয়ে না যাও। তার মধ্যে তোমার চিত্ত যেটা নিতে ইচ্ছা করবে তাই

কেবল নেবে। যা তার মতে মিলছে না তা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করবে। যে জিনিস তুমি চাও না এমন কিছু হলেও তোমার মধ্যে তার দাগ লাগবে না। এই ভাবেই তোমার ব্যক্তিত্বের গঠন শুরু হবে। সেই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠলে তবেই তুমি তা ভগবানকে নিবেদন করতে পার, কারণ যা তোমার নেই তা তুমি দিতেও পার না; কিছু না থাকলে কিছুই দেওয়া যায় না। সুতরাং আপন স্বতন্ত্র অহংটিকে ঘোচাবার জন্য ঐ ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরি সমর্পণ করতে হবে, কোন কিছু বাদ না রেখে। তুমি কিছু দিতে চাইলে তোমার নিজের কিছু অস্তিত্ব থাকা চাই, সুতরাং ব্যক্তিত্ব থাকা চাই। তোমার দেহটা যদি এমন শক্তপোক্ত না হ'ত—যা অবশ্য আছেই—তোমার হাড়পাঁজরার উপরে যদি এমন শক্ত চামড়ার আবরণ না থাকত, তুমি যদি কেবল প্রাণমনের জিনিসই হতে তাহলে তুমি হতে নিত্য টল্‌টলে জেলির মত। পরস্পরে তাতে মিশে গিয়ে তাহলে যথেচ্ছভাবে জড়াজড়ি করতে, তাহলে সেটা কি দুর্দৈবের ব্যাপার হ'ত! সেইজন্য তোমাকে গোড়া থেকেই এমন শক্তপোক্ত করা হয়েছে। আর তুমি অনুযোগ করছ যে তুমি এমন কঠিন, অনমনীয়, তোমার এমন সাবলীলতা নেই যাতে ভগবানে মিলিয়ে যেতে পার! কিন্তু এই রকম হওয়াই দরকার ছিল। কারণ তুমি যদি দেহাশ্রয় ছেড়ে প্রাণময় জগতে চলে যাও তাহলে দেখতে পাবে সেখানকার কাণ্ড: সব কিছুই সেখানে মিশে যাচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে, জড়াচ্ছে, নানা রকম স্পন্দন ও তরঙ্গ তুলছে, নানা শক্তি আসাযাওয়া করছে, ঝটাপটি করছে, পরস্পরকে টানছে আবার ঠেলে

দিচ্ছে ! ব্যক্তিত্ব বলে কিছুই সেখানে নেই। কেবল আছে বিভিন্ন শক্তি ও তাদের ক্রিয়া, প্রবণতা ও কামনা। ব্যক্তি যে কেউ নেই তা নয় তবে তারা কেবল শক্তি মাত্র, সে জগতে তারা কেবল সুর কিংবা অসুর !

আর তুমি যদি কেবল স্থূল মনের গড়াই হতে, মাথা এবং মস্তিষ্ক বাদ দিয়ে, তাহলে তা হ'ত হাটবাজারের মত: যত রকমের ভাব-ধারণা ওর মধ্যে ঢুকে কাটাকাটি করত, ঠেলাঠেলি হতে থাকত তাতে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটতে পারত। তার মধ্যে তোমার নিজের নিজস্ব মনকে তুমি খুঁজেই পেতে না।

কেবলমাত্র নিজেকে প্রকৃতভাবে গড়ে তুলতে হলে তোমাকে যত্নের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে, দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে অনেক বছর পরিশ্রম করতে হবে। কেবলমাত্র এইটুকুর জন্য, যাতে তুমি আপন পন্থায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পার, এরই জন্য তোমায় অনেক খাটতে হবে। তুমি মনে কর যে তুমি বুঝি নিজেরই ভাবে চিন্তা করে থাক, কিন্তু তুমি জান না যে যাদের সঙ্গে তুমি কথা বল, যে সব জিনিস তুমি পড়, তারই প্রভাবের উপর তোমার চিন্তা কতখানি নির্ভর করে ; হাঁ, আরো নির্ভর করে তোমার খাদ্য হজম কিংবা বদহজমের উপর, তুমি বদ্ধ ঘরে অথবা মুক্তবায়ুতে থাক তার উপর, তোমার আশপাশের দৃশ্যাবলীর উপর, এমনকি প্রাকৃতিক রোদ-বৃষ্টির উপর। তুমি লক্ষ্য কর না, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি বিভিন্ন রকম ভাবে ভাবতে থাক, যার সঙ্গে তোমার আপন সত্তার কোনই সম্পর্ক নেই। তাই বলছি

যে নিজস্ব ভাবে ও সুসঙ্গত ও যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার শক্তি পেতে হলে তোমাকে দীর্ঘকাল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিশ্রম করতে হবে। তারপর যখন তুমি এত কষ্টে এ কাজ সম্পন্ন করে মনের গঠনকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করে তুলেছ, যখন তা একটা পুরোপুরি শক্তপোক্ত গঠন নিয়েছে, তখন তোমাকে এই কথা বলা হবে যে, যদি তুমি ভগবানে মিলিত হতে চাও তাহলে তোমার ঐ জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলতে হবে! এই প্রথম অংশটি না করতে পারলে তুমি তার দ্বিতীয় অংশটিতে যেতেই পারবে না, অর্থাৎ মনকে এইভাবে গড়ে তুলতে না পারলে তুমি ভগবানকে কিছু সমর্পণ করতেই পারবে না! কারণ তুমি এমন একটা এলোমেলো জিনিসের সমষ্টি যা প্রকৃতপক্ষে তুমি নও। আগে তোমার অস্তিত্ব চাই, তোমার তুমি হওয়া চাই, তবে নিজেকে সমর্পণ করতে পার।

বর্তমানের অবস্থাতে যা ভগবানে অর্পণ করা দরকার তা হল তোমার দেহকে অর্পণ করা। কিন্তু সেটিই কেউ দেয় না। হাঁ, তুমি তোমার কর্মকে, তোমার দৈহিক পরিশ্রমকে নিবেদন করতে চেষ্টা কর; কিন্তু তার মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে যা সত্য নয়, খাঁটি নয়।

তুমি প্রশ্ন করতে পার যে দেহকে কেমন করে ভগবানে মিলিয়ে দেওয়া যাবে? মনকে, প্রাণকে, চিন্তাকে ও ভাবকে, ধারণা ও আস্পৃহাকে অবশ্য ভগবানে মিলিয়ে দেবার কথাটা বোঝা যায়, কিন্তু দেহকে তো ভগবানের কটাহের মধ্যে গলিয়ে মিলিয়ে দেওয়া যায় না! অথচ ঐ দেহটাই তোমার এমন জিনিস যাকে তুমি তোমার বিশেষ নাম ধরে বলতে পার যে

এই হল স্বয়ং আমি, যদিও তা একটা নির্ধারিত নাম মাত্র। অবশ্য যদি তুমি আয়নার সামনে নিজের চেহারা দেখ তাহলে দেখবে যে কুড়ি বছর তুমি যেমন ছিলে এখন আর সেই তেমন তুমি নও, এখন তার থেকে এমন বদ্‌লে গেছ যে চেনা যায় না। তথাপি তুমি বোধ কর যে এই তুমি সেই তুমি। যাকে তুমি সব চেয়ে ভাল করে জান তাকে দেওয়া দিয়েই তোমার কাজ শুরু কর।

আমি তোমার কোন জটিল ব্যাপারে যেতে বলছি না। এই কথা বলছি যে তুমি যখন ভগবানে বিলীন হতে বা মিলিত হতে চাইছ, তখন আগে জানা দরকার যে বাস্তবিক তুমি কি বস্তু। তুমি দেখবে যে বস্তুতঃ তোমার অহং রয়েছে সেখানে। এই অহংবোধ থেকেই তুমি সচেতন আছ, নিজে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধারণ করে,—তুমি একটা গণ্ডগোলযুক্ত মেছোহাটার মত কিছু নও, তোমার স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া চাই, তার জন্যই তোমার অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ওই চর্মের দেহাবরণ—যাতে নিজেকে পৃথক করে রাখ এবং যার মধ্যে বাইরের কিছু ঢুকতে পারে না তোমার নিজের ইচ্ছা ব্যতীত।

এর পর থেকে নিজেকে আরো গড়ে তুলতে হবে, নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে পুরোপুরিভাবে ও বিশদভাবে, কেবল এমনি সাধারণভাবে নয়। যেখানে যতটুকুকে তোমার নিজের বলে জান সমস্তকেই একটা কেন্দ্রে মিলিত করতে হবে, সেই কেন্দ্র তোমার আত্মা, তোমার ভিতরকার দিব্যসত্তা, সেখানে সমস্তকে নিয়ে তুমি হবে অখণ্ড একসত্তা। এই দিব্যকেন্দ্রকে ঘিরে যখন তুমি সচেতন এক পূর্ণসত্তা হয়ে উঠবে, তখনই তুমি

তাকে ভগবানে নিবেদন বা উৎসর্গ বা মিলিত করতে পারবে; তখনই ভগবান সেই মিলন ঘটতে দেবেন। অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্ব যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখন ভগবান তোমার ওই অহংকে তাঁর মধ্যে ডুবিয়ে নেবেন, তখন তুমি কেবল ভগবানের জন্যই বর্তমান হয়ে বেঁচে থাকবে'

দিব্য প্রেম

"দিব্য প্রেম অতি তীব্র হলেও তাতে সত্তার মাঝে চাঞ্চল্য আসে না"—(*The Elements of Yoga*)

তা আসবেই-বা কেন? চাঞ্চল্য এলে বুঝতে হবে সেটি দিব্য প্রেম নয়, অন্যজাতীয় প্রেম। আসল দিব্য প্রেম তেমন হতেই পারে না, কারণ যার যতখানি সামর্থ্য ঠিক সেই অনুপাতেই সেখানে দিব্য প্রেমের উদয় হয়।

দিব্য প্রেম সর্বত্র পূর্ণভাবেই বিরাজমান, সে এক প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু শতকরা নিরানব্বুই জন মানুষ তাকে টের পায় না। যার যতটুকু পরিসর সে ততটুকুই মাত্র অনুভব করে, অর্থাৎ যার যেটুকু গ্রহণযোগ্যতা। বস্তুতঃপক্ষে তুমি দিব্য প্রেমে ছাপাছাপি আবহাওয়ার মধ্যেই সর্বক্ষণ ডুবে আছ। ক্বচিৎ কখনো হয়তো বিরল কয়েকটি মুহূর্তের জন্য অকস্মাৎ যখন তার কিছু একটু জানান পাও, তখন বল "আমার দিব্য প্রেমের স্পর্শ মিলে গেছে"। ঐরকম ভাবে কথাটা যদিও বললে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা হয় তা এই যে কোন এক অবসরে নিজেই তুমি উন্মীলিত হতে পেরেছিলে, তাই সর্বক্ষণ বিরাজিত দিব্য প্রেমকে একবার মাত্র অনুভব করতে পারলে। দিব্য প্রেমও যেমন সর্বত্র আছে, দিব্য চেতনাও তেমনি আছে। দুটি তো একই জিনিস। সর্বদাই তা বিরাজিত, কেবল তুমি তা জানতে পার না কিংবা হঠাৎ এক-আধবার জানতে পার। যখন বিনা কারণেই খুব বেশি আনন্দ বোধ করতে থাক তখন বল

যে এতদিনে তোমার দিব্য প্রেমের স্পর্শলাভের সৌভাগ্য হল! কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। তোমারই মধ্যে কিছু একটু খুলে গেছে, হয়তো সামান্য একটি পিনের মত সরু ছিদ্র, তারই ভিতর দিয়ে সে জিনিস ঢুকে গেছে; কারণ আবহাওয়ার মধ্যে তা সর্বদা ছেয়েই আছে, যেখানে প্রবেশ করার সম্ভাবনা ঘটছে সেখানেই তা প্রবেশ করছে। সকল দিব্য বস্তুর সম্বন্ধেই এই কথা। নিত্যই তা বিরাজিত: কেবল তুমি নিজে বন্ধ আছ, বুঁজে আছ, নিজের দরজা ভেজিয়ে রেখেছ বলেই তাকে জানতে বা গ্রহণ করতে পারছ না। তোমার মধ্যে তাকে নেবার জায়গা নেই, অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সবটা জায়গা জোড়া। তোমার নিজেকে নিয়েই নিজের ভিতরটি ঠাসা, কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে নয় কিন্তু সদা সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, কাজেই সেখানে অপর কিছু ঢুকতে পারে না। তাহলে কেমন করে তুমি দেখবে কত কিছু তোমার চতুর্দিকে ছড়ান? কেবল যখন নিজের সজাগ সক্রিয়তা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়, তখন ফাঁক পেয়ে তোমার সম্পূর্ণ অজানিতে তার একটু চকিত ঝলক ঢুকে পড়ে, কিন্তু তাও তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়। মানুষের অহং এমনই ভয়ঙ্কর জিনিস; তার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু কেবল তারই প্রয়োজনে। তুমিই প্রধান কেন্দ্র, তোমাকে ঘিরেই সব কিছু, এই তোমার দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বের দিকে যখন তাকাও তখন বিশ্বকে তুমি দেখ না, দেখ কেবল নিজেকে।

তাহলে আগে তোমাকে ঐ অহংএর গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসিতে হবে। ওর থেকে বেরিয়ে প্রথম ধাপে এক অনস্তিত্বের অবস্থায় গিয়ে পড়া চাই। তখন হতেই যেন দূর থেকে দেখার

মত কোন জিনিসটি বাস্তবিক কেমন তা দেখতে শুরু করবে। সব জিনিসকে যদি তার প্রকৃত স্বরূপে দেখতে চাও তাহলে হতে হবে আয়নার মত—তেমনি স্থির, নিশ্চল, নিরপেক্ষ, প্রশান্ত, অবিকৃত প্রতিবিম্বটিকে গ্রহণক্ষম। তখন তাহলে এমন অনেক কিছু দেখতে পাবে যা আগে ছিল বলেই জানতে না, এই নতুন দেখছ। নিজেকে নিয়ে নিজে তুমি যে এই অনন্ত বিশ্বের একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ, সেইটুকুর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ না থেকে তুমি অনেক জিনিসই দেখতে পাবে। ঐ অহংএর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার নানাবিধ উপায় আছে। জগৎকে সঠিকভাবে জানতে হলে, সে যে কেবল তোমার প্রয়োজনেই নয় এ সত্যটি বুঝতে হলে সেই চেষ্টাই আগে করতে হবে।

অহংএর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে আগে তোমার মনে সেই ইচ্ছাটি জাগা চাই। এর পক্ষে সবচেয়ে সুনিশ্চিত উপায় হল ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া, অর্থাৎ তাঁকে তোমার দিকে টেনে আনতে না চেয়ে নিজেকেই তাঁর দিকে নিবেদন করতে থাকবে। এতে তুমি নিজেকে ভুলতে শুরু করবে। সাধারণতঃ যারা ভগবানকে ভাবে, তারা তাঁকে (কিংবা তাঁর প্রতিনিধিকে) নিজের দিকেই টানে, যাতে তিনিই ভিতরে চলে আসেন। কিন্তু তার ফলে কিছুই তাদের মেলে না। তখন তারা বলে: "এত করে ডাকছি, এত তাঁকে চাইছি, এত প্রার্থনা জানাচ্ছি, তবু তাঁর সাড়া পাচ্ছি না, কিছুই আমার মিলছে না।" কিন্তু এমন নালিশ না করে নিজেকে আগে জিজ্ঞাসা করে দেখ যে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন

করেছিলে কিনা। দেখবে যে তা তুমি করনি, বরং তাঁকেই ধরে আনতে চেয়েছিলে। মুক্তহৃদয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার বদলে হতে গিয়েছ তুমি কৃপণ, হতে গিয়েছ ভিক্ষালোভী। নিজের দিকটায় খিল এঁটে বসে ভগবানকে পুরোপুরি তারই মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছ, অথচ এদিকে নিজের অহংএর বাঁধনের মধ্যে তুমি আটক রয়েছ। যে বস্তু তোমার চতুর্দিকে বিরাজিত, যা তোমার মধ্যে নিত্যই আসতে চায়, তাকে প্রত্যাখ্যান করছ কঠিন দেয়ালের অবরোধ দিয়ে, ইচ্ছা করেই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ। আপনি রয়েছ আপনার কারাগারে বন্দী হয়ে, আর বিক্ষোভ করছ যে কিছুই পেলে না, কিছুই বুঝলে না। অন্ততঃ যদি একটি জানলাও খুলে রাখতে তবু কিছু উপরের আলোবাতাস পেতে পারতে।

বুদ্ধ ও শঙ্কর

(১)

জীবন হল মায়া, এই তত্ত্বটিকে ভিত্তি করেই জগতে জীবনপথ বর্জন করার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ-শিক্ষার প্রবর্তন করেন বুদ্ধ। তিনি এই কথা বলেছিলেন যে জীবনের সৃষ্টি বা জগতের মাঝে তার অস্তিত্ব ঘটে কামনার ফলে, আর এর ভিতরকার অপরিহার্য দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হল এই অস্তিত্বের বাইরে চলে যাওয়া। শঙ্করও এই পথই নিয়েছিলেন। তিনি ওর উপরে আরো বেশি কথা বলেছিলেন যে অস্তিত্ব কেবল কামনারই ফল নয়, ওর সমস্তটাই মায়া, আর মানুষ যতক্ষণ এই মায়ার মধ্যে ডুবে থাকে ততক্ষণ সে আসল বস্তু ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার কাছে পরমেশ্বরের কোন অস্তিত্বই নেই। তাঁর মতটি ছিল এই ধরনের। কিন্তু বুদ্ধের কাছে ভগবান বলেও কিছু ছিল না।

অবশ্য দুজনেই একটা সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। বুদ্ধ যে সত্যবস্তুর নাগাল পেয়েছিলেন তাকে বাহ্য জীবনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বললেন অনস্তিত্ব, যে অনস্তিত্বের মাঝে অস্তিত্বের সকল কিছু ব্যাপার তলিয়ে যায়। এমন এক অবস্থা তো আছেই। কথিত আছে যে এমনি অনস্তিত্বের শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করে কেউ যদি কুড়ি দিনের বেশি সেই অবস্থাতে থেকে যায়, তাহলে তার স্থূলদেহও লয়প্রাপ্ত হবে। তা হতে পারে,

কারণ সেই অবস্থাই তখন তার কাছে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন ভাবটি অনুভূতি রূপেও অন্তরালে থেকে যেতে পারে, তখন তা অমন নির্বিশেষ অবস্থা না হয়ে একটা বিশেষ চেতনা রূপেই রয়ে গেল। অর্থাৎ বাহ্য জগৎ ও বাহ্য চেতনার সঙ্গে সংস্পর্শটিও বজায় রইল, এবং তার তলে তলে রইল এমন কিছু যা ওর সকল বিষয় হতে নিরপেক্ষ ও মুক্ত। এমন অবস্থা এনে ফেলতে পারলে তুমি বাহ্য চেতনার দিক দিয়েও প্রভূত উন্নতিসাধন করতে পার; কারণ তখন তুমি যা কিছুই করবে তা নিরাসক্ত ও নির্লিপ্তভাবে, আর সেই কারণে তোমার বাহ্য জীবনেও আভ্যন্তরীণ মুক্তির অভিব্যক্তিটাই প্রকাশ পেতে থাকবে। সেই আভ্যন্তরীণ মুক্তি তোমার মধ্যে যখন একবার এসে যাবে, যা অনন্ত ও চিরন্তন তার সঙ্গে তোমার সচেতন সংস্পর্শ একবার ঘটে যাবে, তখন সেই বিশেষ চেতনাকে না হারিয়েই তোমার কাজের মধ্যে তুমি ফিরে আসবে আর তোমার সকল সক্রিয়তার উপর তারই প্রভাব কাজ করতে থাকবে।

শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেছেন উপরের শক্তিকে নামিয়ে আনা। জগতের রূপান্তর আনা সম্ভব কববার পক্ষে এই হল একমাত্র উপায়; কারণ তুমি সচেতন থেকে চাইছ এক নূতন শক্তিকে এখানে নামিয়ে আনতে, নূতন রাজ্যের অবতারণা করতে, এক নূতন চেতনাকে এখানকার বাহ্য জগতের মধ্যে এনে ফেলতে। সে চেতনা এসে পড়লে ও তার কাজ হতে থাকলে অমন একটা পরিবর্তন আসা অবশ্যম্ভাবী, তাতেই আমরা আশা করছি যে তার দ্বারা বাহ্য জগতের আমূল রূপান্তর ঘটে যাবে।

(২)

বুদ্ধ যে একটা দিকের সন্ধান পেয়েছিলেন তাতে কিছু সন্দেহই নেই ; কিন্তু দ্বিতীয় দিকের কথাটি তিনি চিন্তা করে দেখেননি, কারণ তা হয়ে পড়ত তাঁর নিজের তত্ত্বের বিরোধী। নির্বাণে পৌঁছনোই তাঁর বিশেষ তত্ত্ব। সকলে জানে যে একটি উপায়ে নির্বাণ পাওয়া যায়, তা হল মৃত্যু। কিন্তু বুদ্ধ বললেন, মৃত্যুর পরেও জীবনের বন্ধন থাকে, তাই পুনর্জন্ম চক্রের ভিতর দিয়ে পুনঃপুনঃ আমাদের আবর্তিত হতে হয়, তবু তাতেও ওর থেকে মুক্তি হয় না। যদিও পুনর্জন্মের উদ্দেশ্যই হল তাই, জন্ম-জন্মান্তরের পরম্পরার ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত মুক্তির অবস্থায় গিয়ে পৌঁছনো। বুদ্ধের আদর্শ ছিল একেবারেই সেখানে গিয়ে পৌঁছনো, যেখানে জগতে অস্তিত্বের আর কোন প্রশ্নই নেই। যেন তিনি বলছেন, এই জগৎ সৃষ্টি করা ভগবানের ভুল কাজ হয়েছে, সে ভুলকে শুধরে নেবার একমাত্র উপায় এই অস্তিত্বের বিলোপ করা। যুক্তির দিক থেকে স্বভাবতঃই তিনি অকাট্য ছিলেন, তাই ভগবান সম্বন্ধে এখানে কোন প্রশ্নই তিনি তোলেননি। কিন্তু এ ভুল করলে কে ? কখন কেমন করে এ-ভুল ঘটল ? এ প্রশ্নের তিনি জবাব দেননি। কেবল বলেছেন কামনা থেকে জগতের উৎপত্তি, অতএব কামনার সমাপ্তি হলে এরও সমাপ্তি।

তিনি প্রায় এমন কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে জগৎ মূলতঃ আত্মমুখী, এই আত্মমুখী একটা সমষ্টিগত মায়ার জোরে সব কিছু চলছে, সে মায়া ফুরিয়ে গেলে জগৎও ফুরিয়ে যাবে। এতদূর পর্যন্ত কিন্তু তিনি এগোননি। শঙ্করই পরে এসে এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করেন।

কিন্তু ওর চেয়েও বহু প্রাচীনতর জ্ঞানের সন্ধানে বৈদিক ঋষিদের যুগে যখন আমরা ফিরে যাই, তখন দেখি যে জগৎকে এড়িয়ে যাবার কোন প্রয়াসই সেখানে নেই ; তাঁরা চেয়েছিলেন এই পৃথিবীতে বাস করেই পরম সিদ্ধিলাভ করতে, এমনকি এক স্বর্ণযুগের কল্পনাও তাঁরা করেছিলেন যখন সেই সিদ্ধি অনায়াস আয়ত্তের মধ্যে আসবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে জীবন্মুক্তির দিকে লক্ষ্য বুদ্ধের শিক্ষার পর থেকেই এসেছে ; তার পর থেকেই দেশের প্রাণশক্তির ক্রমশ অবনতি ঘটেছে, কারণ ঐ আদর্শে জীবন থেকে তফাৎ হয়ে থাকার দিকেই প্রচেষ্টা আসে। বাহ্য বাস্তবতাকে মায়া বলেই ধরা হয়, সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্কটা যত ছেড়ে যায় ততই ভাল। এর ফলে সকলে তখন বিশ্বশক্তির বহির্ভূত হয়ে থাকার দিকে ঝুঁকল, তাতে প্রাণশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকল, তাতে পার্থিব পরিণতির সম্ভাবনাও অনেক কমে গেল।

(৩)

বুদ্ধকে অনেকে বলে অবতার, অনেকে বলে না।

ভারতে যে সব অবতারের নাম আমরা জানি তাঁরা হলেন বিষ্ণুর অবতার (অর্থাৎ ভগবানের যে অংশটি সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা)। ভগবান যে স্বয়ং পৃথিবীতে এসে জন্ম নিতে পারেন এই কথা তাঁরা প্রমাণ করতে এসেছিলেন। আর যতবার এসেছেন শিবের অবতার (অর্থাৎ ভগবানের যে অংশ ধ্বংসকর্তা ও নব রূপান্তরের প্রণেতা), ততবার তাঁরা পার্থিব মায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন ও বর্তমানকে ধ্বংস করেছেন।

আমার মনে হয় যে বুদ্ধ এই শিবশক্তিরই অবতার ছিলেন। কারণ শিবের মতই ছিল তাঁর অনুকম্পা ও সমগ্র মানবের প্রতি সমবেদনা, আবার তেমনই তাঁর ধ্বংসশক্তি, অবশ্য রূপান্তর আনার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু তাতে গড়ার চেয়ে ভাঙার দিকটাই ছিল বেশি।

তাঁর কাজ খুব গঠনমূলক বলে মনে হয় না। তখন মানুষকে অহংভাব বর্জন করা সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়াই প্রয়োজন ছিল। সেই হিসাবে তাঁর প্রচারিত শিক্ষা খুব কার্যকরী হয়েছিল।

কিন্তু মূলতঃ পৃথিবীর ও পার্থিব জীবনের বিশেষ রূপান্তর আনা তাতে হয়নি। পার্থিব জীবনে কোন উচ্চতর চেতনা আসেনি; বরং বাহ্য বিষয় থেকে চেতনাকে অপসৃত করার চেষ্টাই হয়েছিল, তাকেই তিনি বলেন সত্য পন্থা।

এখন তাঁর অবতারত্ব সম্বন্ধে এই কথা যে বৌদ্ধেরা তাঁকে ভগবানে দাঁড় করিয়েছে। বৌদ্ধদের মন্দিরে তাঁকে দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করা দেখলেই বুঝবে যে মানুষের প্রকৃতিই তাই, যাকে তারা শ্রদ্ধা করে তাকে ভগবানরূপে প্রতিপন্ন করার দিকেই তারা ঝোঁকে।

দিন তারিখের বৈশিষ্ট্য

কোন নির্দিষ্ট দিন বা পর্যায়ক্রমিক তারিখের কি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে ?

তারিখ অনুযায়ী পঞ্জিকা গড়ে তোলা মানুষের একটা প্রথা। তেমনি একটা পঞ্জিকাকে যদি সর্বত্রই মানা হয়, যে চেষ্টা এখন হচ্ছে, তাহলে সেটি এক শক্তিশালী অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বহুর মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আনতে হলে আগে বহু মানুষকেই তাই মানতে হবে। তাহলে তার যে কাঠামো দাঁড়াবে তাতে একরূপ শক্তির অবতারণা হবে, সে হবে এক জীবন্ত মূর্তি, তাকে প্রতীক হিসাবে কাজে লাগান চলবে। লোকে প্রতিমূর্তি গড়ে তাকে প্রতীক হিসাবে নিয়ে থাকে, কিন্তু সেটা চলে তাদের নিজেদেরই দলের মধ্যে, যেমন স্বপ্নের প্রতীক অনেকে ধার্য করে নেয়। কিন্তু এগুলি হল নিজেদের তরফের জিনিস, যারা ব্যক্তিগত ভাবে মানবে তাদের পক্ষেই তা খেটে যাবে।

কিন্তু যে পঞ্জিকাকে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী মেনে নেবে, তার প্রতীকক্রিয়া হবে অতি বিস্তীর্ণ। ওর প্রভাব কাজ করবে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে। কিন্তু তা কেবল প্রথাসাপেক্ষ, যত বেশি লোক যে অনুপাতে তাকে মেনে চলবে সেই অনুপাতেই তার সাফল্য। ইউরোপের পঞ্জিকাকে এখন কোটি কোটি লোক মানছে, তার বদলে যদি মাত্র তিন চারজনে তা মানত, তাহলে সেই শুধু কয়েক জনের মধ্যেই তা প্রতীকের

কাজ করত। অতএব এর নিজের কিছু মূল্য নেই, তা নির্ভর করছে মানুষের ব্যবহারিক স্বীকৃতির উপর।

আমি বলেছি যে, প্রথাই প্রতীকরূপে কাজ করে। তার মানে এই স্থূল প্রথার দ্বারা সূক্ষ্মের নাগাল পেতে পার, স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মের যোগাযোগ আনতে পার। সেখানেই ওর সার্থকতা।

এখানে আবার এসে পড়ছে জ্যোতিষ ও কোষ্ঠিবিচারের কথা, যা নিয়ে মানুষ অনেক রকম ভুল করে। কিন্তু সেও একটা ভাষারূপ ও প্রচলিত প্রথা ভিন্ন আর কিছু নয়। এ প্রথাকে যদি তুমি মেনে নাও তাহলে একে নিয়ে তুমি নিজের অনেক কাজে লাগাতে পার। তবে যত বেশি মানুষে এ-প্রথাকে বিশ্বাস করছে তার উপরেই ওর মূল্য আর গুরুত্ব নির্ভর করছে। কিন্তু যদি তুমি তাকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার মধ্যে গুটিয়ে আন, তাহলে যতই তা করতে যাবে ততই সেটা অন্ধ-সংস্কারের মত হয়ে দাঁড়াবে। কারণ অন্ধসংস্কার বলতে কি বোঝায়? যদি কোন এক নির্দিষ্ট কথাকে সাধারণ সত্য হিসাবে ধরে নিয়ে সর্বত্রই সব কিছুতেই তার অন্ধপ্রয়োগ করতে থাক তো সেই হবে অন্ধসংস্কার।

এ-কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি প্রায়ই উল্লেখ করি সেই মইয়ের নীচে দিয়ে পার হতে যাবার গল্পটি। একবার একটি লোক কোথাও মই লাগিয়ে তার উপর উঠে কাজ করছিল, তার হাত থেকে একটা ভারি কাটারি ফস্‌কে নীচে পড়ে। ঠিক সেই সময়েই অন্য একজন মইয়ের তলা দিয়ে পার হচ্ছিল, কাটারিখানা তার মাথায় পড়ে মাথাটি ফাঁক হয়ে যায়। যারা এ ঘটনা দেখেছিল তারা এর থেকে এক সাধারণ অনুজ্ঞা দাঁড় করিয়ে

বললে যে কখনও কোথাও মইয়ের তলা দিয়ে যাওয়াই অনুচিত, ওতে নিশ্চয়ই অমঙ্গল আছে। একেই বলে খাঁটি অন্ধসংস্কার।

বস্তুতঃ ভালমন্দ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জেনে রেখেছি তা এই প্রকারেই জানা হয়ে থাকে। অনুকূল রকমের যোগাযোগের দরুন একটা কোন বস্তু ব্যবহার করে যদি কয়েকজন ব্যক্তি কোন রোগ থেকে মুক্ত হল, তাই থেকেই সেই রোগের এক ঔষধ আবিষ্কার হয়ে গেল। তার পরে ক্রমশ প্রচার হতে থাকল যে তা অমুক রোগে একেবারে অব্যর্থ। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তা প্রায়ই হয় না। সে জিনিস একশ' ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করলে তা একশ' রকম বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করবে : কখনো-বা তার থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হতে দেখা যাবে। একই রকমের ফলাফল দুজনের বেলাতে হয় না। সুতরাং যে রোগ সেরেছে তা যে কেবল ঐ ঔষধের উপরেই একান্ত বিশ্বাস নিয়ে থাকা একটা অন্ধসংস্কার।

কিন্তু এর চেয়েও আরো বেশি যদি এগিয়ে দেখি তাহলে বলতে পারি যে অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানেরও খুব কমই পার্থক্য। যা কিছু বিশেষ পার্থক্য রয়েছে তা ঐ দুটি বিভিন্ন তরফ থেকে বলবার ভঙ্গিতে। বৈজ্ঞানিকদের মত যদি তুমি খুব সতর্কতার সঙ্গে সব দিক বাঁচিয়ে বলতে পার, "এটা এইরকম হবে বলেই প্রতীতি হচ্ছে, এগুলি এই ভাবে হতে দেখা যাচ্ছে বলেই আমরা এই সিদ্ধান্ত করছি", ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহলে তাকে আর অন্ধবিশ্বাস বলা চলবে না। কিন্তু তুমি যদি বেপরোয়া হয়ে সরাসরি বলতে যাও, "এটা নিশ্চয়ই এই-রকম" তাহলেই সে কথা অন্ধবিশ্বাসের পর্যায়ে গিয়ে পড়ল।

অর্থসম্পদের মূল্য

যার যত বেশি অর্থ, তার তত বেশি বিপদ। হাঁ বাছা, বিপদ বৈকি।

টাকা থাকলেই ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। ওতে মানুষকে বোকা বানিয়ে দেয়, লোভী করে, হীন করে। জীবনে ও এক বৃহত্তম রকমের বিড়ম্বনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিষ্কাম নির্লিপ্ত হতে না পারছ ততক্ষণ পর্যন্ত বেশি টাকার মালিক না হওয়াই ভাল। যখন তোমার চেতনা পৃথিবীর মত উদার ও ব্যাপক হবে, কেবল তখনই তোমার পক্ষে পৃথিবীর সকল ধনে ধনী হওয়া ঠিক হবে, তাতে সকলেরই ভাল হবে। কিন্তু তেমন অবস্থায় না পৌঁছলে যত বেশি টাকা তোমার হাতে আসবে ততই তা হবে তোমার পক্ষে অভিসম্পাতের মত। এ কথা আমি সকলের মুখের উপরেই বলছি, এমনকি যারা মনে করে ধনী হওয়া পরম সৌভাগ্য তাদের শুনিয়েও বলছি। একে বিপদই বলব ; এমনকি হয়তো এ এক চরম দুর্ভাগ্যের অবস্থা, যার প্রতি ভগবানের কৃপা নেই সেই খুব ধনী হয়, ওটি তাঁর বিরাগের লক্ষণ।

গরিব-বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে ধনী-বুদ্ধিমান হওয়া অনেক বেশি কঠিন—তার মানে ধনী থেকেও জ্ঞানবান হতে পারা, বিশেষ করে ধনী থেকেও উদারচেতা হওয়া খুবই কঠিন। আমি অনেক দেশের অনেক মানুষ দেখেছি, অনেকের কথাই জানি : যারা সব চেয়ে বেশি উদার তারা সব চেয়ে বেশি গরিব, এই চিরকালই দেখেছি। যেমনি কারো পকেট ভরে ওঠে, অমনি

রোগ এসে যেন তাদের আক্রমণ করে, টাকাপয়সার এমনি একটা মারাত্মক আকর্ষণী। আমি নিঃসন্দেহ হয়েই বলছি, অর্থসম্পদ একটা অভিশাপ।

অতএব অর্থ সম্বন্ধে প্রথম কর্তব্য হল এই যে বেশি হলেই তা দিয়ে দেবে। কিন্তু যথোচিত বিবেচনা না করে যেমন তেমন ভাবে দেওয়া নয়। জনহিত করছি বলে যারা অর্থদান করে তাদের মত যেন না হয়; কারণ ওতে দানের গর্বে নিজেকেই বড় করা হয়, মস্ত একজন দাতা বলে নিজেকে জ্ঞান করা হয়। নিষ্কাম সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে অর্থ দেবে, অর্থাৎ এই কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করবে যে কোথায় অর্থ দিলে তার সব চেয়ে ভাল সদ্ব্যবহার হবে। অতএব দেবার সময় প্রত্যেককেই তার সর্বোচ্চ চেতনা দিয়ে বিচার করতে হবে কিসে তা সর্বাপেক্ষা সার্থক কাজে লাগবে।

বস্তুতঃ অর্থ যখন কাজে খাটে তখনই তার দাম। প্রত্যেকের পক্ষেই এই কথা, অর্থকে যখন ব্যয় করা হয় তখনই তার দাম মেলে। অর্থমুদ্রা তৈরি করার জন্য মানুষ এমন উপাদান বেছে নিয়েছে যার সহজে ক্ষয় নেই, যেমন সোনা ও রুপা, কিন্তু তাকে চালু হতে না দিয়ে অচল অবস্থাতে জমিয়ে রাখলে নৈতিকভাবে তাকে নষ্টই করা হল। আজকাল ধাতুর বদলে কাগজের নোট চলছে, কিন্তু সেই নোটের তাড়া যদি তোমার ড্রয়ারের মধ্যে ভরে রাখ, তাহলে কিছুকাল পরে তা নষ্ট হয়ে যাবে, পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করবে। ব্যাঙ্কেও তখন সে কাগজ আর নিতে চাইবে না।

অনেক ধর্মে আর অনেক মানুষে বলে থাকে যে ভগবান

যার প্রতি প্রসন্ন হন তাকে তিনি দরিদ্র করেন। এ কথা যথার্থ কিনা তা বলতে পারি না। কিন্তু একথা ঠিকই যে জন্ম থেকেই হোক বা পরে ধনী হয়েই হোক, কেউ যদি প্রচুর অর্থের মালিক হয়, তাহলে দেখা যায় যে ভগবানের কৃপালাভের জন্য সে নির্বাচিত হয়নি; ধনীকে ভগবৎকৃপা লাভ করতে হলে খেসারৎ স্বরূপ তার অনেক দোষত্রুটি শোধরাতে হবে, অনেক কষ্টে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হবার সত্যিকার পথটি খুঁজে পাবে।

অর্থসম্পদ অবশ্যই এক রকম শক্তি; আগেও তাই বলেছি, এ হল প্রকৃতির এক বিশেষ শক্তিস্বরূপ। কিন্তু এ-শক্তি নিত্য সঞ্চাবিত হওয়া চাই, সঞ্চরণেই এর সার্থক অভিব্যক্তি, যেমন সঞ্চারিত জলপ্রবাহ থেকে আমরা প্রচুর শক্তি আহরণ কবতে পারি ও তা কাজে লাগাতে পারি। তার দ্বারা উৎপাদন হতে পারে, অনেক কিছুর সুব্যবস্থা হতে পারে। অর্থ হল পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের উপযুক্ত মাধ্যম—কারণ শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে এ জিনিস মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই অর্থশক্তি এমন লোকের হাতে থাকা উচিত যে এর সার্থক প্রয়োগ করতে জানে, অর্থাৎ যা আমি আগেই বলেছি, যাবা নিজেদের লোভ জয় কবেছে, ব্যক্তিগত কামনা ও আসক্তির বন্ধন থেকে যারা মুক্ত হতে পেরেছে, তাদের হাতেই যাওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন তাদের এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই যাতে তারা পার্থিব জীবনে কোথায় ওর চাহিদা রয়েছে তা বুঝতে পারে আর সে চাহিদাকে পূরণ করবার জন্য এই শক্তিকে তারা যথোচিত ভাবে নিয়োগ করতে পারে।

উপরন্তু সেই সকল ব্যক্তির যদি উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনা থাকে, তাহলে তারা এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে এমন কিছু গড়ে তুলতে পারে যা দিব্যশক্তির ও ভগবৎকৃপার সম্যক অভিব্যক্তির সহায়ক হয়। তা যদি করা যায়, তখন এই অর্থশক্তি অভিশাপের বদলে অমূল্য বর হয়ে উঠবে, জগতের সকলেরই তাতে মঙ্গল হবে। একটা কথা আছে যে সবচেয়ে যা মন্দ জিনিস তাই সবচেয়ে ভাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এটা দেখতে হবে যে সবচেয়ে যা ভাল হবার কথা তা যেন সবচেয়ে মন্দ হয়ে না দাঁড়ায়, কারণ তা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই পরম সম্ভাবনাপূর্ণ প্রবল শক্তিকে মন্দ পথে প্রয়োগ করতে থাকলে তার থেকে মানুষের চরম দুর্ভাগ্য এসে পড়তে পারে; আবার এই একই শক্তিকে ভাল পথে প্রয়োগ করলে তার থেকে পরম সৌভাগ্যও মিলে যেতে পারে।

নিয়োগের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, নিজস্ব গুণ আছে, জগতে তার একটা শুভ প্রয়োগ আছে। কিন্তু এখনকার জগতে খুব কম জিনিসই তার সমুচিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, খুব কম জিনিসই তার সমুচিত সার্থকতা পায়। এখানে সবকিছুই অব্যবস্থিত, তাই হতে পেরেছে এমন দুঃখ দুর্দশার রাজ্য। প্রত্যেক জিনিসটি যদি সুসঙ্গত ভাবে তার আপন সার্থকতা অনুযায়ী কাজ করতে পারত, তাহলে এত দুঃখ-কষ্টের বাধা না পেয়ে সমগ্র জগৎ আপনা হতেই উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারত।